বধূবরণ

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

ত্রিবেণী প্রকাশন

২ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট,

কলিকাতা-১২

প্রথম ত্রিবেণী সংস্করণ : আষাঢ় ১৩৬০
দ্বিতীয় ত্রিবেণী সংস্করণ : আষাঢ় ১৩৬৫

প্রকাশক
কানাইলাল সরকার
১৭৭এ, আপার সার্কুলার রোড
কলিকাতা-৪

মুদ্রক
শ্রীজিতেন্দ্র নাথ বসু
দি প্রিণ্ট ইণ্ডিয়া
৩।১, মোহন বাগান লেন
কলিকাতা-৪

প্রচ্ছদ ব্লক
ভারত ফটোটাইপ ষ্টুডিও

প্রচ্ছদ মুদ্রণ
নিউ প্রাইমা প্রেস

বাঁধাই
ওরিয়েণ্ট বাইণ্ডিং ওয়ার্কস

প্রচ্ছদ শিল্পী
সেবতী সরকার

বর্ণলিপি
অর্ধেন্দু দত্ত

দু' টাকা পঁচাত্তর নয়া পয়সা

আমার পুরানো দিনের বন্ধু

'**বনফুল**' কে

দিলাম

বধূবরণ

নারীর সঙ্গে এমনি করিয়াই জীবনে তাহার প্রথম পরিচয়।

বাসন্তী চিঠি লিখাইতে আসে। বলে, 'লেখ প্রাণেশ্বর—'

প্রাণেশ্বরের অর্থ বুঝিবার মত বয়স তখন ননীমাধবের হইয়াছে। মুখ-কান তাহার লাল হইয়া ওঠে, সলজ্জ একটুখানি হাসিয়া ঘাড় নাড়িয়া বলে, 'না।' কিন্তু না বলিলে চলে না। বাসন্তীর শহুরে স্বামী সেদিন তাহাকে গেঁয়ো ভূত বলিয়া উপহাস করিয়া গিয়াছে। সুতরাং উহা তাহাকে লিখিতেই হইবে।

বাসন্তী তাহার হাতখানি চাপিয়া ধরিয়া বলে, 'না ভাই, লক্ষ্মী মানিক আমার!'

তা হাত ধরিবার দোষ নাই। এই সেদিন পর্যন্ত দুজনে এক-সঙ্গে খেলা করিয়াছে। দুর্ভাগ্য ননীমাধবের।

পনের বছরেই বাসন্তীকে দেখায় যেন এক মস্ত ডাগর মেয়ে; আর চোদ্দ বছরের ননীমাধব, সে যে-ছোটকে সেই ছোট!

উপরোধে কে নাকি ঢেঁকি গিলিয়াছিল, এ ত সামান্য কথা।

ননীমাধবকে লিখিতে হয়। কিন্তু তাহার পর অনর্গল যে-সব কথা বাসন্তীর মুখ দিয়া বাহির হইতে থাকে, চিঠিতে তাহা লিখিবার নয়; তবু ননীমাধব যা হক করিয়া লিখিয়া চলে।

বাসন্তী বলে, 'পড় দেখি—শুনি।'

ননীমাধব উঠিয়া দাঁড়ায়। বলে, 'পারব না।'

বাসন্তী লেখাপড়া জানে না। কিন্তু যাদুবিদ্যা জানে হয়-ত। সে এক অদ্ভুত গ্রীবাভঙ্গী করিয়া আয়ত ঢলঢলে চোখ দুইটি তুলিয়া ননীমাধবের দিকে ফিরিয়া চাহিতেই তাহাকে বসিতে হয়। যাহা না লিখিয়াছে তাহাও পড়িয়া শোনায়। বাসন্তী খুশী হইয়া বলে, 'আর, দুটি কথা।' ননীমাধব আবার বাঁকিয়া বসে।

কিন্তু এবার আর চোখের চাহনি দিয়া নয়, গ্রীবাভঙ্গী করিয়া নয়, বাসন্তী হাতে ধরিয়া টানিয়া তাহাকে কাছে বসাইয়া কি যে বলে কে জানে, ননীমাধব তৎক্ষণাৎ গলিয়া জল হইয়া গিয়া আবার লিখিতে শুরু করে। নিচের উঠান হইতে মামীমা ডাকেন 'ননী!'

ভয়ে একেবারে জড়সড় হইয়া জিভ কাটিয়া ননী তাহার হাতের কলম দোয়াতের ভিতর ছাড়িয়া দেয়। বেলা তখন পড়িয়া আসিয়াছে। মাটির ঘরের দোতলায় ছোট্ট জানালাটির পাশে তাহারা বসিয়াছিল। জানালার পথে উঁকি মারিয়া বাসন্তী বলিল, 'হয়ে গেল মাসীমা, ওকে দিয়ে একখানা চিঠি লিখিয়ে নিচ্ছিলাম মাসীমা, হয়ে গেছে।' বলিয়াই সে ননীমাধবের মুখের পানে তাকাইয়া পিঠে হাত দিয়া বলিল, 'দে ভাই, দে তাড়াতাড়ি ওইটুকু শেষ করে দে।'

কিন্তু ননীমাধব তখন মামীমার ভয়ে কাঠ হইয়া গিয়াছে। সে আর কিছুতেই কলম হাতে লইল না। বলিল, 'কাল হবে।' বলিয়াই সে তাড়াতাড়ি উঠিয়া একরকম ছুটিয়াই নীচে চলিয়া গেল।

সুনয়না তখন গোয়ালে বাছুর বাঁধিয়া উঠানে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন। ননীমাধবকে দেখিবামাত্র দাঁত কিসমিস করিয়া উঠিলেন, 'আ, মরণ আর-কি! বাপ পাঠিয়েছে পড়তে, পড়া না তোর পিণ্ডি হবে।'

বাসন্তী চলিয়া গেলে তিনি আবার শুরু করিলেন, 'ওই সব ধিঙ্গি ধিঙ্গি মেয়ে, লজ্জাও ত লাগে না মা! কেন, দিনের মাথায় ওদের ত চিঠি লিখতে পারিস পঞ্চাশ গণ্ডা, আর আমি যা বলেছি, লিখেছিস তোর বাপকে?'

ননীমাধব ঘাড় নাড়িল। বলিল, 'কাল লিখব।'

'এখনও কাল? বলেছি কতদিন তার ঠিক নাই। লিখিস, পাঁচ টাকায় আর চলবে না বাপু, আমি হিসেব করে দেখেছি। কাপড় একজোড়া কিনে দিয়েছি, তার দাম যেন পাঠিয়ে দেয়। আমি দেব কোত্থেকে? এতদিন পাঠিয়ে দেওয়া তার উচিত ছিল। মিন্‌সের বেশ আক্কেল যা হক!'

এমন সময় পাড়ার একজন মেয়ে আসিয়া উঠানে দাঁড়াইল, 'কি গো, কি হচ্ছে? ভাগনের সঙ্গে কথা হচ্ছে বুঝি?'

'হ্যাঁ মা, এস। কই তুমিই বল দেখি চন্দর মা, এই ছেলের ছুবেলা খাওয়া আছে, জল খাওয়া আছে, ইস্কুলের মাইনে আছে, তার ওপর ছেলে মানুষ করা বলে কথা—হেন-তেন সাত-সতের ত আছেই। তা বাপ ওর মাসে পাঁচটি করে টাকা পাঠিয়ে দিয়েই খালাস। তাই বলছিলাম লেখ তোর বাপ-মিন্‌সেকে, মিন্‌সের অভাব ত নেই গা, কিপ্পন মিন্‌সে দিতে চায় না, বুঝলে?—বস চন্দর মা বস।'

বাপ-মিন্‌সে এই গ্রামেরই জামাই! চন্দর মা তাহাকে চিনিত। বলিল, 'শশধরের অভাব কি মা!' বলিয়াই সে বসিল। বলিল, 'বুড়ো বয়েসে মিন্‌সে আবার বিয়ে করতে কেন গেল গা! এমন সুন্দর ছেলে, বিয়ে দিলেই ছুদিন পরে ঘর-সংসার সবই হত।'

সুন্দর ছেলে তখন সরিয়া পড়িয়াছে।

কিন্তু ননীমাধব ঘাড় নাড়িলে কি হইবে; মেয়েরা ছাড়ে না। চিঠি আসিলে তাহা পড়াইতেও হয়, আবার জবাব না লিখিলেও চলে না। একা বাসন্তী ছিল, এখন আবার আরও পাঁচজন আসিয়া জুটিয়াছে। ছুলী আসে, চঞ্চলা আসে, সখী আসে, মালতী আসে।

মামীমার ভয়ে বেচারা ননীমাধব সর্বদা সশঙ্কিত হইয়া থাকে। সুনয়নার বাড়ি সুবিধা হয় না।

চঞ্চলা বলে, 'চ ভাই, আমাদের বাড়ি চ।' বাড়ি তাহাদের একেবারে ফাঁকা। রান্নাঘরের দোতলাটায় বাস কেহ করে না। আধখানা জুড়িয়া শুকনো বালি বিছাইয়া সম্বৎসরের আলু রাখা হইয়াছে। বাকি আধখানা হাঁড়িতে-কলসিতে বোঝাই।

তাহারই এক ধারে কোনমতে একটুখানি জায়গা করিয়া লইয়া চঞ্চলার চিঠি লেখা চলে। চঞ্চলার চিঠি লেখা না ছাই! চিঠি লিখাইতে সে জানে না।

ননীমাধবের পাশে গিয়া বসে। বসিয়া বলে, 'দে না ভাই একটা জবাব লিখে। ও কি লিখেছে দেখলি ত?'

ননীমাধব বিপদে পড়ে। বলে, 'বাঃ, আমি কি লিখব? তোর চিঠি, তুই বল, আমি লিখি।'

চঞ্চলা বলিবার চেষ্টা করে। একটুখানি সরিয়া বসিয়া চোখ বুজিয়া কিছুক্ষণ ধ্যানস্থ হইয়া ভাবে, তাহার পর খিল খিল করিয়া হাসিয়া ওঠে।

'নাঃ, আমি পারব না বলতে।'

ননীমাধব তখন নিজেই লিখিতে শুরু করে। লেখে 'শ্রীচরণ কমলেষু, আপনি কেমন আছেন, আমি ভাল আছি!'

লিখিয়া পড়িয়া শোনায়। ননীও হাসে, চঞ্চলাও হাসে। হাসিতে হাসিতে একেবারে গড়াইয়া পড়ে। চঞ্চলা বলে, 'বাস! এইবার ঠিকানা লিখে ফেলে দাওগে যাও।' এমন সময় সিঁড়ির দরজায় শব্দ হয়।

সহসা হাসি থামাইয়া চঞ্চলা বলে 'কে!'

ননীমাধব ভয়ে জড়সড় হইয়া জিভ কাটিয়া সরিয়া বসে। চুপি-চুপি বলে, 'কে ভাই, মামী নয় ত?'

'না।' বলিয়া চঞ্চলা উঠিয়া গিয়া খিল খুলিয়া দেখে, মালতী। 'ওমা, তুই?'

হাসিতে হাসিতে দুম্ দুম্ করিয়া সিঁড়ি বাহিয়া দুজনেই উপরে উঠিয়া আসে। মালতীরও চিঠি লিখাইবার কথা ছিল। চঞ্চলা বলে, 'তুই ভাই আগে লেখা।'

ঠোঁট উল্টাইয়া মালতী বলে, 'না ভাই, আমার অত শখ নেই। তার চেয়ে আয় বরং আমরা বৌ-বৌ খেলি।'

বৌ-বৌ খেলা তাহারা ছোটবেলায় খেলিয়াছে। খেলাটা তেমন ভালও নয়। চঞ্চলা প্রথমে রাজি হয় না। কিন্তু মালতী ছাড়িল না। বলিল, 'না ভাই, খেলতেই হবে।'

ননীমাধব দেখিল, চিঠি লেখার চেয়ে বৌ-বৌ খেলা ঢের ভাল। দুজন মেয়ে। একজন বৌ, একজন ননদ। ননীমাধব হইল বর। কিন্তু কে ননদ আর কে বৌ, এই লইয়া বচসা বাধিল। শেষে মালতীরই হইল জিত। তাহার বৌ হইবার বড় সাধ।

নিচের সিঁড়িটা হইল তাহাদের বাড়ি। আর উপরের ঘরখানা হইল কলিকাতা শহর।

কলিকাতায় ননীমাধব চাকরি করে। হঠাৎ একদিন উপরের কলিকাতা হইতে চাকরি করিয়া হাসিমুখে ননীমাধব তাহার নিচের সিঁড়ির ঘরে আসিয়া পৌঁছিল।

কিন্তু আসিয়াই দেখে, মহামারী কাণ্ড! ননদ-ভাজে ঝগড়া করিয়া দুজনে দুই সিঁড়ির ধাপে গম্ভীরভাবে বসিয়া আছে। দুদিন ধরিয়া তাহাদের রান্না নাই, খাওয়া নাই, কথা কওয়া ত একেবারেই বন্ধ হইয়াছে। বৌ কাঁদিয়া-কাটিয়া ঝগড়ার বিবরণ তাহাকে যাহা জানাইল, শুনিয়া মনে হইল বোনের দোষ, আবার বৌ-এর কাছ হইতে উঠিয়া বোনের কাছে গিয়া বসিতেই বোন যাহা বলিল, তাহাতে মনে হইল বৌ-এর দোষ।

কি করিবে বেচারা বর ত তখন ভাবিয়াই অস্থির! চুপিচুপি বৌ-এর কাছে পরামর্শ চাহিতেই অভিমান করিয়া মুখ ফিরাইয়া বৌ বলিল, 'যাও!'

অনেক সাধ্য-সাধনা করিয়া বৌ-এর মান যখন ভাঙিল, বৌ তখন ধরিয়া বসিয়াছে, সে আর এমন মুখরা ননদের কাছে বাস করিবে না। করিতে হইলে কোনদিন বিষ খাইয়া মরিবে। সুতরাং তাহাকে কলিকাতায় লইয়া যাওয়া হক।

ননীমাধব বোনকে অনেক করিয়া বুঝাইতে লাগিল। মালতী চোখ টিপিতেই বুঝিতে তাহার দেরী হইল না।

ননীমাধব তৎক্ষণাৎ তাহার কোঁচড় হইতে পনেরটি আলুর টাকা গুনিয়া গুনিয়া চঞ্চলার আঁচলে ফেলিয়া দিয়া বৌকে লইয়া কলিকাতা রওনা হইল।

কলিকাতা হইতে তাহারা আর ফেরে না! বোনের রাগ তখন পড়িয়া গিয়াছে। ক্রমাগত চেঁচাইয়া চেঁচাইয়া চিঠি পাঠাইতে থাকে, 'বাবা রে বাবা, টাকা ফুরিয়ে গেল এবার আমি খাই কি!

টাকা না পাঠালে এবার আমি পরের বাড়ি ভাত রাঁধব গিয়ে। আমাকে এখানে একা ফেলে রেখে কেমন নিশ্চিন্তি আছে দেখ ত!'

কিন্তু অন্ধকার সিঁড়ির নীচে মশা ভন ভন করিতেছিল। অনেকক্ষণ বসিয়া বসিয়া চঞ্চলা সত্যই একটুখানি চঞ্চল হইয়া উঠিল। বলিল, 'না ভাই, এস এবার।'

তুজনেই নামিয়া আসিল। চঞ্চলা বলিল, 'এবার ভাই আমি বৌ হব।'

মালতী বলিল, 'না ভাই অনেকক্ষণ এসেছি। যাই এবার। মা বকবে।'

চঞ্চলা বলিল, 'তবে আবার কাল খেলব। তুই আসবি ত ভাই?'

ননীমাধব ঘাড় নাড়িয়া বলিল, 'হ্যাঁ।'

ননীমাধবের বাবার কাছ হইতে চিঠির জবাব আসিয়াছে।

শশধর লিখিয়াছেন, পাঁচটাকার বেশি তিনি পাঠাইতে পারিবেন না। একটি ছেলের জন্য মাসিক পাঁচ টাকাই যথেষ্ট।

চিঠির খবর ননীমাধব দিন পাঁচ-ছয় চাপিয়া রাখিয়াছিল।

মামীমা ক্রমাগত জিজ্ঞাসা করেন, 'হাঁরে চিঠি তুই লিখেছিলি ত? না মিছে কথা বলছিস?'

ননীমাধব বলে, 'লিখেছি।'

কিন্তু চিঠির জবাব যখন কিছুতেই আসে না, তখন সুনয়না তাহাকে এবং তাহার বাবাকে উদ্দেশ করিয়া এমন-সব কটু কথা বলিতে শুরু করিলেন, যাহা শুনিলে মানুষের রাগ হইবারই কথা।

ননীমাধব তখন আর সংবাদটা চাপিয়া রাখা উচিত মনে করিল না। বই-এর দফতর খুলিয়া তাহার একটি পাঠ্যপুস্তকের ভিতর হইতে সযত্ন-রক্ষিত তাহার পিতার চিঠিখানি আনিয়া মামীমার পায়ের কাছে ফেলিয়া দিয়া ম্লান-মুখে সেইখানেই দাঁড়াইয়া রহিল।

সুনয়না ভাবিয়াছিলেন ঠাকুর-জামাইএর অগাধ সম্পত্তি, তাও

আবার একটিমাত্র ছেলে, দশটি করিয়া টাকা ত সে নিশ্চয়ই পাঠাইবে, এমন-কি বেশি পাঠাইতেও পারে। চিঠি এতদিন তাঁহার না লেখানই অনুচিত হইয়াছে। বলিলেন, 'পড় বাবা, পড়ে শোনা, আমি ত আর পড়তে জানিনে।' ননীমাধব ধীরে ধীরে চিঠিখানি পড়িয়া শুনাইল। সুনয়নার মুখ-চোখ তখন লাল হইয়া উঠিয়াছে। গম্ভীরভাবে বলিলেন, 'হুঁ।' বলিয়াই গুম হইয়া বসিয়া রহিলেন।

পরদিন হইতে ননীমাধবের আর স্বস্তি রহিল না। উঠিতে-বসিতে যখন-তখন মামীমা তাহাকে যা তা বলিতে আরম্ভ করিলেন। সব দোষ যেন তাহারই। বেচারা চোরের মত ঘরে আসিয়া ঢোকে, আবার চোরের মত বাহির হইয়া যায়। কি যে করিবে কিছুই ভাবিয়া পায় না।

এক-একবার ভাবে তাহার বাবাকে একখানা চিঠি লিখবে; আবার ভাবে, কাজ নাই, এমনি করিয়া যতদিন চলে চলুক। বাবাকে জীবনে সে তাহার খুব কমই দেখিয়াছে, লিখিতে ভয়ও করে, আবার লজ্জাও হয়। ভাবে, এই লইয়া মালতীর সঙ্গে একবার পরামর্শ করিবে। মামীমা তাহার চোখের সুমুখে খাবার থালা ধরিয়া দিয়া প্রত্যেকটি জিনিসের দর কষিয়া দেখাইয়া দেন যে, প্রতিদিন দুবেলায় অন্তত পক্ষে আট আনা মূল্যের আহার্য বস্তু সে গলাধঃকরণ করিতে পারে তাহার মাসিক ব্যয় পনের টাকার পরিবর্তে তিনি যদি পাঁচটাকা করিয়া গ্রহণ করেন, তাহা হইলে দশটি করিয়া টাকা তাঁহাকে লোকসান দিতে হয়। এবং প্রতিমাসে এতগুলি টাকা লোকসান বহন করিবার মত সামর্থ তাঁহার নাই।

বলেন, 'জানি আমি। দিষ্টি-কেপ্পন সে মিন্‌সেকে আমি চিনি না! তার চেয়ে কাজ নেই বাপু, নিজের ছেলে নিজের কাছে নিয়ে গিয়ে রাখুক, ভাল-মন্দ খাওয়াক পরাক, যা খুশী তাই করুক, তাতে আমার কি! আমি একে গরিব মানুষ, নিজেই খাব কি তার ঠিক নেই, আমি কোথায় পাব বল!' ননীমাধব একটি কথারও জবাব দেয় না।

সুনয়না বলেন, 'পরের চিঠি লিখতে খুব বাহাদুর! চিঠি কি তুই ভাল করে লিখেছিলি? গুছিয়ে লিখতেই যে পারিসনি!'

ননীমাধব তবু চুপ করিয়া থাকে।

'চুপ করে রইলি যে? আ-মর্! তার বেলা মুখে রা নেই। পাঁচ পাঁচ দশটাকা আমার তুমাসের বাকি পড়ে রয়েছে এখনও। কালই চিঠি লিখে দিস, টাকা যেন আমায় লোক দিয়ে পাঠিয়ে দেয়, আর অমনি নিয়ে যায় যেন তোকে।' ননীমাধব বলে, 'দেব।'

সুনয়না বলেন, 'দেব নয়—দিস।' বলিয়া একটুখানি থামেন। থামিয়া আবার শুরু করেন, 'দেবে এমনি করে আমার মত পঞ্চোপচার সাজিয়ে তুবেলা! খাবি। খাবি আর কি, সৎ-মায়ের ঝাঁটা খাবি লাথি খাবি। সৎ-মা মাগী দজ্জাল বাটপাড়ের একশেষ। জানি আমি। শুনেছি রে, সব শুনেছি। শুনতে কিছু বাকি থাকে না।'

ননীমাধব চিঠি লিখিল, কিন্তু তাহার জবাবের অপেক্ষা আর করিতে হইল না।

বাসন্তী আজ কয়েকদিন হইতেই ননীমাধবকে খুঁজিয়া বেড়াইতেছিল। কিন্তু ননীমাধবকে খুঁজিয়া পাওয়া আজকাল নাকি তুঃসাধ্য। তাহার মামীমা অন্তত তাহাই বলেন। তবে তাহাকে খুঁজিয়া বেড়াইবার কারণ যাহা, তাহা সকলের কাছে বলিবার নয়। বাসন্তী এই লইয়া আর বেশি হৈ চৈ করিতে পারে না।

বৈকালে গা ধুইবার জন্য কলসি কাঁখে লইয়া দল বাঁধিয়া মেয়েরা পুকুরে যায়। অন্যদিন চঞ্চলাই বাসন্তীকে ডাকিতে আসে। সেদিন সে আসিল না দেখিয়া বাসন্তী নিজেই তাহার বাড়ির দিকে চলিতে লাগিল। গিয়া দেখে, নিস্তব্ধ বাড়ির প্রাঙ্গণে মাত্র বয়েকটা কাক উড়িয়া উড়িয়া বেড়াইতেছে, কোথাও কাহারও সাড়াশব্দ নাই। বাসন্তী ডাকিল, 'চঞ্চলা!'

সুমুখে টিনের ঘরটার উপর হইতে কে যেন সাড়া দিল, 'যাই।'

বাসন্তী একটুখানি আগাইয়া গিয়া দেখে, দরজার খিল খুলিয়া মালতী বাহির হইয়া আসিতেছে। মালতীকে দেখিবে বাসন্তী তাহা ভাবে নাই। জিজ্ঞাসা করিল, 'চঞ্চলা কই?'

'আসছে।' বলিয়া আঙুল বাড়াইয়া মালতী উপরের সিঁড়ি দেখাইয়া দিল।

বলিল, 'আসছে, চল।'

বাসন্তী কিন্তু গেল না। বলিল, 'দেরি করছিস কেন লা? সন্ধ্যে হয়ে যাবে যে! ঘুমোচ্ছিস বুঝি?'

বলিতে বলিতে এক এক ধাপ করিয়া সিঁড়ি উঠিতে উঠিতে উপরে গিয়া দেখে, চঞ্চলা তখন উঠিয়া দাঁড়াইয়াছে। পশ্চাতে ননীমাধব। হাসিয়া বলিল, 'চিঠি লেখাচ্ছিলাম ভাই।'

বাসন্তী হাসিল না, একটি কথাও বলিল না, ননীমাধবের দিকে একবার মাত্র তাকাইয়াই গম্ভীর ভাবে চুপ করিয়া রহিল।

বৈকালে তিন চার জনে দল বাঁধিয়া পুকুরে যাওয়া তাহাদের প্রতিদিনের অভ্যাস। হাসিতে গল্পে সময়টা তাহাদের কাটে ভাল। সেদিন কিন্তু বাসন্তীর মুখ দিয়া আর কথা সরে না।

বেশি কথা বলা চঞ্চলার স্বভাব নয়। কথা বলিতেছিল মালতী। বাসন্তীর শুনিবার ইচ্ছা নাই অথচ মালতী ক্রমাগত বলিয়া চলে।

পুকুরের কাছে গিয়া বাসন্তী বলিল, 'আঃ, চুপ কর না ভাই, আবোল-তাবোল বকচিস কেন মিছেমিছি!' লজ্জায় মালতী চুপ করিল।

বাসন্তী এবার আর চঞ্চলাদের বাড়ি গিয়া উঠান হইতে তাহাকে চীৎকার করিয়া ডাকে না।

চোরের মত পা টিপিয়া টিপিয়া প্রায় প্রত্যহই তাহাদের বাড়ি গিয়া টিনের ঘরখানার সিঁড়ির দরজাটার পাশে চুপ করিয়া দাঁড়ায়। কোনওদিন দেখে, ভিতর হইতে দরজা বন্ধ, উপরে তাহাদের চিঠি লেখা চলিতেছে। মাঝে মাঝে দুএকটা কথা শোনা যায় মাত্র। আবার কোনদিন-বা নিরাশ হইতে হয়। দেখে দরজা খোলা, আলুগুলা সরান হইয়াছে, আর তাহারই পাশে মালতী, চঞ্চলা, সখী ও সুমতী, চারজনে মুখোমুখি বসিয়া কড়ি চালিয়া দশ-পঁচিশ খেলিতেছে।

দিন সাত-আট পরে একদিন সে দরজা বন্ধ দেখিয়া চৌকাঠের পাশে গিয়া কান পাতিয়া দাঁড়াইয়াছে, শুনিল, দরজার ওপারে সিঁড়ির উপর হইতে সখী বলিতেছে, 'দেরি হচ্ছে, এবার কিন্তু ভাই আমি চিঠি লেখাব়।'

ব্যাপারটা বাসন্তী ভাল বুঝিতে পারিল না। চিঠি লেখালেখির কথা শুনিয়া আন্দাজে ভাবিল, ননীমাধব সেখানে নিশ্চয়ই আছে।

'যাচ্ছি।' গলার আওয়াজ ননীমাধবের।

বাসন্তী তাহাও শুনিল। এবং শুনিয়া অবধি সর্বাঙ্গ তাহার রী রী করিতে লাগিল। অন্যদিন সে অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকে। দাঁড়াইয়া থাকিয়া থাকিয়া যখন আর সহ্য হয় না, তখন ডাকে, 'চঞ্চলা, আয়।' আজ কিন্তু সে-অবসর তাহার আর রহিল না, তেমনি পা টিপিয়া টিপিয়া সেখান হইতে সরিয়া পড়িল।

ধীরে ধীরে শীত পড়িতেছে। সুনয়না তাঁহার ঘরের দাওয়ায় বসিয়া কাঁথা সেলাই করিতেছিলেন। বাসন্তী বলিল, 'কি করছ মাসী?'

'কেন দেখতে পাচ্ছিস না কি করছি?' এই বলিয়া মুখ না তুলিয়াই তিনি বলিতে লাগিলেন, 'চিঠি লেখাতে আর আসিস না যে বাসু? আর আসবি কার কাছে মা! হতভাগা বাড়িতে কি আর থাকে কোনদিন!'

বাসন্তী বলিল, 'কোথা থাকে তা তুমি জান মাসীমা?'

'কি করে জানব বাছা, তোরাই জানিস।'

'এস, দেখবে এস।' বলিয়া বাসন্তী তাঁহার হাত ধরিয়া একরকম টানিয়াই তুলিল এবং জোর করিয়া তাঁহাকে চঞ্চলাদের বাড়ি লইয়া গিয়া দরজার কাছে চুপি চুপি বলিল, 'দাঁড়াও তুমি।' বাসন্তী ডাকিল, 'চঞ্চলা!'

টিনের ঘরের দোতলার মৃদু গুঞ্জন সহসা থামিয়া গেল। এমন অসময়ে বাসন্তী কোনওদিন ডাকে না।

'যাই' বলিয়া চঞ্চলা নামিয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'কি?'

বাসন্তী বলিল, 'ননীমাধব আছে ?'

দূরে সুনয়নাকে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া হতভম্ব হইয়া শুকনো-মুখে চঞ্চলা শুধু ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, 'আছে।'

বাসন্তী বলিল, 'ডাক।'

চঞ্চলা ডাকিতেই চোরের মত ধীরে ধীরে ননীমাধব আসিয়া দাঁড়াইল। সুনয়না তখন অনেকখানি আগাইয়া আসিয়াছেন। তিনি আর কোনও কথাটি বলিলেন না, টপ করিয়া বাঁ হাত দিয়া তাহার চুলের মুঠি ধরিয়া যৎপরোনাস্তি প্রহার লাগাইয়া দিলেন। ননীমাধবের মুখ দিয়া একটি কথাও বাহির হইল না, চোখ দিয়া দর দর করিয়া জল ঝরিতে লাগিল। সুনয়নার তখন রোখ চাপিয়া গিয়াছে, কিছুতেই তিনি থামিতেছেন না দেখিয়া বাসন্তী জোর করিয়া তাঁহার হাত ধরিয়া থামাইয়া দিল। সুনয়না রাগে থর থর করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে বলিলেন, 'হ—ত ভাগা!'

সখী, চঞ্চলা, মালতী, বাসন্তী, সকলেই দাঁড়াইয়াছিল। ননী-মাধব মুখ তুলিয়া কাহারও মুখের দিকে তাকাইতে পারিল না, নীরবে মাথা হেঁট করিয়া চোখ মুছিতে মুছিতে দ্রুতপদে সেখান হইতে চলিয়া গেল।

সেই যে চলিয়া গেল, আর সে ফিরিল না। পাঁচ-ছ ক্রোশ দূরের একটা গ্রামে দেখা গেল, রাত্রি প্রায় দ্বিপ্রহরের সময় ননীমাধব মাত্র তাহার কাপড়খানি গায়ে দিয়া চারিদিকে প্রাচীর-ঘেরা একটি বাড়ির দরজায় গিয়া ডাকাডাকি করিতেছে।

অগ্রহায়ণের শেষ। সকাল সন্ধ্যায় আজকাল রীতিমত শীত। ছেলেটা বোধকরি এতখানি পথ একরকম ছুটিয়াই আসিয়াছে। তাহা না হইলে আজ আর তাহাকে এই শীতের রাত্রে থর থর করিয়া না কাঁপিয়া সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে হইত না। অনেক ডাকাডাকির পর একটি মেয়ে আসিয়া দরজা খুলিয়া দিল। ছিপছিপে দোহারা গড়ন। বয়স কুড়ি. কি পঁচিশ কিছুই বুঝিবার উপায় নাই। বাঁ-হাতে একটি কেরোসিনের কুপি। সেই আধো-আলো আধো-অন্ধকারে দেখা গেল মুখখানি সুন্দর, চোখদুটি ঢলঢলে।

আন্দাজে ঠাহর করিয়া ননীমাধব হেঁট হইয়া একটি প্রণাম করিল। উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, 'বাবা আছে?'

মেয়েটি জিজ্ঞাসা করিল, 'তুমি কে?' 'আমি ননীমাধব।'

'ও' বলিয়া ঠোঁটের ফাঁকে একটুখানি হাসিয়া মেয়েটি তাহাকে আলো দেখাইয়া বলিল, 'এস।'

পাকা ইঁটের ছোট্ট একটি একতলা বাড়ী। স্নমখে একটুখানি রক। সিঁড়ি দিয়া উঠিয়া গিয়া দরজার কাছ হইতে ভিতরে একটা তক্তাপোশের দিকে আঙুল বাড়াইয়া মেয়েটি বলিল, 'যাও ওইখানে। জ্বর হয়েছে তোমার বাবার।' মিনিট পনের-কুড়ি মেয়েটিকে আর দেখা গেল না।

ঘরের এককোণে একটি লণ্ঠন জ্বলিতেছিল। তক্তাপোশের উপর আপাদমস্তক লেপমুড়ি দিয়া বোধ করি তাহার বাবা শুইয়া আছেন। ননীমাধব শিয়রের কাছে গিয়া চুপ করিয়া বসিল।

মেয়েটি পুনরায় ফিরিয়া আসিয়া ঘরে ঢুকিতেই দেখে, ননীমাধব তখনও তেমনি চুপটি করিয়া হেঁটমুখে বসিয়া আছে, লজ্জায় বোধহয় বাবাকে সে আর ডাকিতে পারে নাই। জোরে জোরে বলিল, 'ওগো শুনছ, দেখ কে এসেছে।'

হঠাৎ ডাক শুনিয়া শশধরের ঘুম ভাঙিয়া গেল। কথাটা ভাল শুনিতে পান নাই। মুখের ঢাকা খুলিয়া হতভম্বের মত চোখ চাহিয়া বলিলেন, 'কি?'

'দেখ তাকিয়ে, কে এসেছে দেখ।'

'কে?' বলিয়া পাশ ফিরিয়া চাহিতেই দেখেন, ননীমাধব। দেখিয়াই একটুখানি অবাক হইয়া গেলেন। বলিলেন, 'তুই? এত রাত্রে?'

মেয়েটি জবাব দিল। 'এসেছে হয়ত রাগ-টাগ করে। গায়ে জামা নেই, পায়ে জুতো নেই, কোঁচার খুঁটে গা ঢেকে এসেছে।'

লেপের ভিতর হইতে একখানা হাত বাহির করিয়া ছেলের হাতখানা চাপিয়া ধরিয়া বাবা জিজ্ঞাসা করিলেন, 'হ্যাঁরে?'

নীরবে শুধু একবার ঘাড় নাড়িয়া ননীমাধব বসিয়া রহিল।

তাহার পর অত্যন্ত ধীরে ধীরে কহিল, 'আর আমি ওখানে থাকব না।'

শশধর কোনও কথাই বলিলেন না, মেয়েটি সুমুখে দাঁড়াইয়াছিল, একবার শুধু তাহার মুখের পানে তাকাইয়া একটি নিশ্বাস ফেলিলেন মাত্র।

সকলেই চুপ।

মেয়েটি সেখান হইতে সরিয়া গিয়া পাশের ঘরের দরজা খুলিয়া ভিতরে ঢুকিল।

ননীমাধবের হাতখানি আর-একবার চাপিয়া ধরিয়া শশধর জিজ্ঞাসা করিলেন, পাঁচ টাকার বেশি দিতে চাইনি, তাই কিছু বলেছে ঠিক। না?' ননীমাধব ঘাড় নাড়িয়া বলিল, 'হ্যাঁ।'

শশধর বলিলেন, 'হুঁ, তা জানি। মাগী চামারের একশেষ।' বলিয়াই ডাকিলেন, 'মায়া!'

ঘরের ভিতর হইতে মেয়েটি সাড়া দিল। 'কী!'

'খাবার-টাবার কিছু···'

'জানি গো জানি, তুমি চুপ কর।' বলিয়া মায়া তৎক্ষণাৎ বাহিরে আসিয়া বলিল, 'এস ননীমাধব, বাইরে জল আছে বালতিতে, হাত-পা ধোও, ধুয়ে এস তুমি খাবে এস।'

খাইতে বসিয়া ননীমাধব দেখে, মামীমার কথা একদম ভুল। দিব্য পরিপাটি করিয়া কার্পেটের একখানি আসন পাতিয়া খাইতে দেওয়া হইয়াছে। পঞ্চোপচার না হক আহার্যের পরিমাণ কম নয়, তরি-তরকারি ভাত ডাল এমন-কি, আস্ত একটা মাছের মুড়া পর্যন্ত দেওয়া হইয়াছে।

হাসিতে হাসিতে মায়া তাহার সুমুখে আসিয়া বসিল। বসিয়া বলিল, 'লজ্জা করিসনে ননীমাধব।' তাহার পর কত কথা।

'রাতের রান্না আমি সবই রেখে দিই। কাল সকালে খাই। শীতকাল। এতক্ষণ হয়ত সব ঠাণ্ডা জল হয়ে গেছে। তোর বাবাকে আমি কতদিন বলেছি তোকে নিয়ে আসতে। উনি বলেন, থাক, বেশ আছে। 'শীত করছে, না? তা ত করবেই। দাঁড়া।'

বলিয়া মায়া হাত বাড়াইয়া সুমুখে কয়েকটা টিনের তোরঙ্গের উপর হইতে গোলাপীবঙের একটি ভাঁজ-করা গায়ের কাপড় টানিয়া আনিয়া ননীমাধবের গায়ের উপর বেশ করিয়া জড়াইয়া দিয়া বলিল, 'খা এবার। সব কটি খেতে হবে কিন্তু।'

পথশ্রমের ক্লান্তির জন্যই বোধকরি তাহার ক্ষুধা পাইলেও ভাল করিয়া খাইতে পারিল না।

শয়নের ব্যবস্থাও চমৎকার! ননীমাধব শুইয়া শুইয়া ভাবিতে লাগিল, এতদিন কেন সে এখানে আসে নাই! মামীমার মার খাইয়া আর একবার সে এমনি চলিয়া আসিতে চাহিয়াছিল কিন্তু ওই বাসন্তীই তাহাকে আসিতে দেয় নাই। চঞ্চলা, মালতী, সখী, সুমতী, সকলের কথাই তাহার মনে পড়িল। কাল হয়ত তাহারা তাহাকে খুঁজিয়া মরিবে। খুঁজুক!

মায়া অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত তাহার বিছানার একপাশে হাতের উপব মাথা রাখিয়া শুইয়া শুইয়া গল্প করিয়া গিয়াছে। দেখিতে সে অনেকটা বাসন্তীর মতই। তাহাকে সে যে কি বলিয়া ডাকিবে তাহাও সে কিয়ৎক্ষণ ধরিয়া চিন্তা করিল। নিজের মা অতি শৈশবেই মরিয়াছে। মা বলিয়া আজ পর্যন্ত কাহাকেও সে ডাকে নাই। ননীমাধবের কেমন যেন লজ্জা করিতে লাগিল। এমনি করিয়া একথা-সেকথা ভাবিতে ভাবিতে সে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। সকালে চোখ মেলিয়া দেখে, মায়া আবার কখন তাহার পাশে আসিয়া শুইয়াছে।

দিনের আলোয় ননীমাধব তাহার ঘুমন্ত মুখখানি ভাল করিয়া একবার দেখিয়া লইতেছে, এমন সময় মায়ার ঘুম ভাঙিল। হঠাৎ চোখোচোখি হইতেই ননীমাধবকে সে তাহার কোলের কাছে টানিয়া আনিয়া ঈষৎ হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'তাকিয়েছিলি যে অমন করে?' নিতান্ত লজ্জিত হইয়া ননীমাধবও হাসিয়া মুখ নামাইল।

রাত্রে যাহাকে সে বাসন্তীর মত দেখিয়াছিল, দিনের আলোয় তাহাকে সে আবার আর-একরকম দেখিল। সে যে এত সুন্দর, গতরাত্রির অস্পষ্ট আলোকে তাহা সে বুঝিতে পারে নাই।

মায়ার নিশ্বাসের বাতাস ননীমাধবের মাথার চুলে আসিয়া

লাগিতেছিল। সে আর অমন করিয়া শুইয়া থাকিতে পারিল না, ধীরে-ধীরে চোখ দুইটি তুলিয়া বলিল, 'উঠি।'

মায়া হাতখানি তাহার ছাড়িয়া দিয়া চোখ বুজিয়া ঘাড় নাড়িয়া বলিল, 'ওঠ।'

গ্রামখানিও মন্দ নয়।

দুচার দিনের মধ্যেই ননীমাধবের সঙ্গী জুটিয়া গেল বিস্তর।

সৎ-মা নাকি কাহারও ভাল হয় না, ননীমাধবেরও ধারণা ছিল তাই। কিন্তু তাহার কপাল ভাল, আসিয়া অবধি সে ধারণা তাহার বদলাইয়া গিয়াছে।

বাপের অবস্থা ভাল, তাহা সে আগেই শুনিয়াছিল। আসিয়া দেখে সত্যই তাই, কোনদিক দিয়া অভাব অনাটন কোনদিন তাহার নজরে পড়ে না। বুড়া বাপ বোধকরি তাহার একটুখানি কৃপণ।

রোজ সকালে জেলে আসিয়া খিড়কির পুকুরে জাল ফেলে। রান্না-ঘরের পাশে, ঘাটে যাইবার ছোট দরজাটির ফাঁকে মাথা গলাইয়া চুপি চুপি ডাকে, 'মা-ঠাকরুন!' মা-ঠাকরুন বঁটি হাতে লইয়া মাছ ভাগ করিয়া ঘাট হইতে একেবারে কুটিয়া বাছিয়া ঘরে লইয়া আসে।

ননীমাধব সেদিন কাছেই দাঁড়াইয়াছিল, মায়া তাহার গলা জড়াইয়া ধরিয়া কানের কাছে মুখ লইয়া গিয়া চুপি চুপি বলিল, 'যা ত ননী, কাপড়ের তলায় মাছটা লুকিয়ে একেবারে এইখানে নিয়ে আয়।'

কিন্তু অমন করিয়া চুপি চুপি বলিবার প্রয়োজন ছিল না। ননীমাধব বলিল, 'বাবা ত বাড়ীতে নেই!'

মায়া বলিল, 'তা হক। আসতেই বা কতক্ষণ!' সত্যই আসিলেন।

আঁচলের তলা হইতে মাছটি ননীমাধব বাহির করিতে যাইবে, এমন সময় সদর দরজার কাছে খুক খুক করিয়া কাশির শব্দে তাকাইয়া দেখে, তাহার বাবা।

'ওটা কি রে?'

ননীমাধব না পারিল জবাব দিতে, না পারিল তাঁহার মুখের পানে তাকাইতে। সকরুণ দৃষ্টিতে একবার সে মায়ার মুখের দিকে তাকাইল মাত্র।

মায়া উনানের কাছে বসিয়াছিল, তৎক্ষণাৎ সে হাসিয়া মুখ ফিরাইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। 'কেন, এত মার-মূর্তি কেন? আর কিছু নয়, একটা মাছ।'

ঘাড় নাড়িয়া শশধর বলিলেন, 'জানি। কিন্তু মাছগুলি বড় হতে আর দিলে না দেখছি।'

মায়া বলিল, 'দুটো নয়, দশটা নয়, একটা ছেলে। কতদিন পরে বাড়ি এল, তোমার পুকুর-ভরা মাছ, কি যে বল তুমি…'

'বলি আমার মাথা আর মুণ্ডু! ছেলে না হয় আজ দশদিন এসেছে, মাছ ধরা চলছে সেই পুজো থেকে ইস্তক আজ পর্যন্ত, একদিনের জন্যেও ত কামাই নেই। কত আর বলব তোমাকে? বলে বলে হায়রাণ হয়ে গেলাম।' বলিতে বলিতে তিনি ঘরে গিয়া ঢুকিলেন।

মাছটা নামাইয়া রাখিতে বলিয়া মায়াও তাঁহার পিছু-পিছু গেল। 'জানি আমি। সকাল থেকে রোদ্দুরে ঘুরলে মাথার কখনও ঠিক থাকে মানুষের! বস, ঠাণ্ডা হও, জল-টল খাও, তারপর যা বলতে হয় বল আমাকে।' বলিয়া গলার কাপড়টা আর-এক ফেরতা ঘুরাইয়া লইয়া হাসিয়া হাত দুইটি কপালে ঠেকাইয়া বলিল, 'অপরাধ হয়েছে মশাই, ক্ষমা করুন।'

শশধরও না হাসিয়া থাকিতে পারিলেন না।

মায়া এতক্ষণে নিশ্চিন্ত হইয়া জলখাবারের থালাটি স্বামীর সুমুখে ধরিয়া দিয়া বলিল, 'যাই, আবার উনানে আলু চড়িয়ে এসেছি।' রান্নাঘরে আসিয়া সে বঁটি লইয়া মাছ কুটিতে বসিল।

'ননীর বিয়ে দেব, রাঙা টুকটুকে বৌ আসবে, তখন আর কষ্ট করে মাছ-টাছ আমায় কুটতে হবে না। কি বল ননী?'

লজ্জায় ননী তাহার মুখের পানে তাকাইতে পারিল না। সেখান হইতে উঠিয়া সে একরকম ছুটিয়াই চলিয়া যাইতেছিল।

মায়া বলিল, 'যাসনে ননী, খেয়ে যাবি।'

কথাটা বোধকরি সে শুনিতে পাইল না। এত আদর, এত যত্ন, জীবনে সে কখনও পায় নাই।

অন্ধ হঠাৎ সূর্য দেখিয়াছে। অসহ্য হইবারই কথা। ননীমাধব 'না'ও বলিতে পারে না, 'হাঁ'ও বলিতে পারে না।

সেদিন সকালে শশধর তাঁহার স্ত্রীকে যৎপরোনাস্তি তিরস্কার করিতেছিলেন। ননীমাধব ঠিক সেই সময়েই ঘরে ঢুকিতেছিল, হঠাৎ শুনিয়া সে দরজার আড়ালে চুপ করিয়া দাঁড়াইল। এখানে থাকিয়া ননীমাধবের পড়াশুনা কিছুই নাকি হইতেছে না। গত কয়েকদিন হইতে শহরের একটা ইস্কুলে তাহাকে পাঠাইবার কথা হইতেছে। তাই তাহার এ আগ্রহ।

শশধর বোধকরি অনেকক্ষণ হইতেই চীৎকার করিতেছিলেন, বলিলেন, 'আমি জানি তোমার স্বভাব। তুমি আর কথা বল না।'

কি কথা সে বলিয়াছে ননীমাধব তাহা শোনে নাই। এবার কিন্তু মায়া চুপ করিয়া রহিল। শশধর বলিলেন, 'সবেতেই তোমার বাড়াবাড়ি। এ আমি আজ বলে নয়, হাজারদিন লক্ষ্য করেছি। বললে কথা শুনবে না, হেসেই উড়িয়ে দেবে এই হচ্ছে তোমার মস্ত রোগ।'

মায়া জবাব দিল। হাসিয়া বলিল, 'কথা তোমার শুনলাম না কবে? হ্যাঁগা? নাও জামাটা খুলে ফেল দেখি, সেই কখন থেকে দাঁড়িয়ে আছি তেল হাতে নিয়ে। আমায় বকতে পেলে আর কিছু তুমি চাও না বাপু, হ্যাঁ। ভাল লাগে না চব্বিশ ঘণ্টা।'

শশধরও হাসিলেন। বলিলেন, 'তোমার ভালর জন্যেই বলছি। লোকে বলবে কি! ওকে ত আর তুমি পেটে ধরনি!'

'তা বলুক লোকে। লোকের মুয়ে ঝাঁটা!' বলিয়া মায়া তাঁহাকে তেল মাখাইতে বসিল।

স্বামী বোধকরি আরাম বোধ করিতেছিলেন। তাই একটুখানি চুপ করিয়া রহিলেন। পরে আবার ধীরে-ধীরে বলিতে লাগিলেন,

'তা বাপু তুমি যা-ই বল, পুরুষমানুষ দেখলেই কেমন-যেন বে-চাল হয়ে পড়। এ যেন তোমার স্বভাবে দাঁড়িয়ে গেছে। বুঝলে?'

মায়া বলিল, 'ছি ছি ছি ছি, আমি গলায় দড়ি দিয়ে মরব না কী, কিছু বুঝতে পারি না বাপু! উলটো কথা কইছ কেন? তোমারই বরং স্বভাব হয়ে গেছে আমায় কিছু না বলে তুমি থাকতে পার না।'

এই বলিয়া একটুখানি থামিয়া সে আবার বলিল, 'ননী আমার পেটের ছেলের মত। ও আবার পুরুষমানুষ হল কবে থেকে? ওকথা তুমি মুখে আনছ কেমন করে গা? লজ্জা করে না? ছি!'

স্বামী এইবার চুপ করিয়া রহিলেন। বুঝা গেল, তিনি নরম হইয়া আসিয়াছেন। কেশ-বিরল মাথাটি তাহার কোলের উপর টানিয়া আনিয়া মায়া বেশ ভাল করিয়া তেল মাখাইতে শুরু করিল। বলিল, 'শীত, পড়েছে কি অমনি চান বন্ধ করেছ! এমন শীত-কাতুরে মানুষ। আজ তুমি চান কর। বুঝলে?'

'চান?' বলিয়া শশধর তাহার কোলের উপর মাথাটা একটুখানি উঁচু করিয়া মায়ার মুখের পানে তাকাইয়া হাসিলেন।

'হাসি নয়, সত্যি বলছি। নইলে শরীর খারাপ হবে।'

কথার ধারা অন্যপথ ধরিয়াছে। তবু কেন না-জানি তাহাদের কাছে যাইতে ননীমাধবের লজ্জাবোধ করিতেছিল। পা টিপিয়া টিপিয়া যেমন আসিয়াছিল তেমনি আবার পলায়ন করিতে যাইবে, পশ্চাতে সহসা মায়ার ডাক শুনিয়া সে থমকিয়া দাঁড়াইল।

'যাস নে ননী, গরম জল ঠাণ্ডা হয়ে গেলে আর আমি গরম করতে পারব না কিন্তু।' অপরাধীর মত ননী ঘরে আসিয়া ঢুকিল।

শশধরেব মাথাটা সরাইয়া দিয়া তেলের বাটি হাতে লইয়া মায়া ননীমাধবের কাছে আগাইয়া আসিল। বলিল, 'বোস।'

বলিয়া জোর করিয়া তাহাকে সেইখানেই বসাইয়া দিয়া বলিল, 'জামা খোল। ওগো তুমি বাইরে রোদে গিয়ে বস ততক্ষণ, তেলটা শুকক গায়ে!' বাহিরে রকের উপর চৌকি পাতা ছিল। শশধর ধীরে-ধীরে তাঁহার মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে সেইখানে গিয়া বসিলেন।

এমনি করিয়া দিন চলে। কিন্তু এমন করিয়া আর কতদিন চলিবে ?

সুযোগ-সুবিধা পাইলেই শশধর ননীমাধবের পড়াশোনার কথা তোলেন। পাড়ার সব দুষ্টু ছেলেদের নাম ধরিয়া তাহাদের অপবাদ ঘোষণা করিতে থাকেন। 'এদের সঙ্গে মিশলেই ছেলের মাথাটি একদম ফর্সা!' সুতরাং যেখানে হক একটা বোর্ডিং-স্কুলে তাহাকে না পাঠাইলেই নয়। কিন্তু আজ পর্যন্ত কেন যে তাহা হইয়া ওঠে না, কে জানে।

সঙ্গী-সাথীদের লইয়া চব্বিশঘণ্টা ঘুরিয়া বেড়ানর অজুহাতে শশধর তাহাকে তিরস্কার করেন।

ননীমাধব দোয়াত-কলম আর একটা খাতা লইয়া লিখিতে বসে। লিখিতে বসিয়া কি যে লিখিবে খুঁজিয়া পায় না। একখানা বইও নাই যে, তাহা দেখিয়া হাতের লেখা অভ্যাস করিবে। নিজের নামটি লিখিয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকে। যে মা তাহার মরিয়া গিয়াছে তাহারই কথা মনে পড়ে। মরিলে মানুষ কোথায় যায়? লেখে, মা, তুমি কোথায় আছ জানি না। তাহার পর আর-কিছু সে লিখিতে পারে না। এই চিঠি লিখিবার প্রসঙ্গে প্রথমেই তাহার চোখের সুমুখে মালতীর মুখখানা ভাসিয়া ওঠে, তাহার পর বাসন্তীর, তাহার পর চঞ্চলার, তাহার পর সখীর। মেয়েদের সঙ্গে জীবনে তাহার এই প্রথম পরিচয়। তাহার পরেই মায়া। তাহার মা কি ঠিক এমনিই ছিল ? আর বেশি কিছু যে ভাবিতে পারে না, ভাবিবার চেষ্টাও করে না। দোয়াত, কলম, খাতা সবই সে সেইখানে ফেলিয়া দিয়া উঠিয়া পড়ে।

শশধব প্রায়ই বলেন, 'আর্লি টু বেড আর্লি টু রাইজ।'

মায়া হাসে। সে বড় মধুর হাসি হাসিয়া বলে, 'আমার মাথা।'

শশধরও রসিকতা করিয়া হাসিয়া বলেন, 'পালন ত কর না কোনদিন। করলে বুঝতে।' কথাটার মানে সেদিন তিনি তাহাকে

বুঝাইয়া দিয়াছেন। মায়া বলে, 'তুমি পালন করছ ত? তাহলেই হল। স্বাস্থ্যের উন্নতি তোমার হক, তাহলেই আমার হবে।'

সন্ধ্যা তখন সবে সাতটা কি সাড়ে-সাতটার বেশি নয়। একে শীতকাল, তায় পাড়া-গাঁ। মনে হয় যেন বেশ রাত্রি হইয়াছে।

শরতের বৈঠকখানার দাবার আড্ডা ভাঙিলে আগাগোড়া বালা-পোষ মুড়ি দিয়া শশধর আসিয়া ঘরে ঢুকিলেন। ঘরের এককোনে লাঠিগাছটি নামাইয়া রাখিয়া ডাকিলেন, 'কই গো—!'

বেশিদূর খুঁজিতে হইল না, সামনেই দেখিলেন, ঘরের মেঝের উপর একটা সতরঞ্চ বিছাইয়া মায়া ও ননীমাধব পাশাপাশি হাঁটু গাড়িয়া সুমুখের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িয়া একটা খাতার উপর কি যেন লেখালেখি করিতেছে।

মায়া তাড়াতাড়ি উঠিয়া আসিল। হাসিতে হাসিতে বলিল, 'আমার চেয়ে ননীর বাংলা হাতের লেখা ঢের—ঢের ভাল।'

শশধর তাহার মুখের পানে একবার তাকাইলেন। তাহার পর গম্ভীরমুখে বলিলেন, 'হুঁ।'

মায়া বলিল, 'হবে না? তোমার লেখা কেমন! বাপকা বেটা··· না সেই কি বলে না—দূর ছাই, আমার ও-সব মনে থাকে না কিছুতেই।' বলিয়া সে এক অপরূপ লীলায়িত ভঙ্গীতে এমন হাসি হাসিতে লাগিল যে, সেই হাসির গুণেই বোধকরি মুহূর্তের মধ্যে ঠিক যেন যাদুমন্ত্রের মত শশধরের অমন রুক্ষ মুখের ভাব কোনদিক দিয়া যে উড়িয়া গেল তাহা টেরও পাওয়া গেল না। কথাটা এমন-কিছু হাসির কথা নয়, তবু শশধর তাহার সেই হাস্যোজ্জ্বল চমৎকার মুখখানির দিকে বিমুগ্ধদৃষ্টিতে বারকয়েক তাকাইয়া নিজেও ঈষৎ হাসিলেন।

হাসিয়া বলিলেন, 'জান না? বাপকা বেটা, সিপাইকা ঘোড়া, কুছ না হোয় ত থোড়া থোড়া।' বলিয়াই তিনি চুপ করিলেন। চোখ-মুখের ভাব দেখিয়া বোঝা গেল, সহসা তিনি অত্যন্ত উল্লসিত হইয়া উঠিয়াছেন।

শশধর একবার হাঁচিলেন।

মায়া বলিল, 'দেখ, [illegible]শ্রাম না, ঠাণ্ডায় বেরিও না। লাগিয়েছ ত ঠাণ্ডা! বেশ হয়েছে, নাও, শোও, পায়ে একটুখানি তেল মালিশ করে দিই।'

বিছানা পাতাই ছিল। শান্ত শিষ্ট শিশুটির মত শশধর তৎক্ষণাৎ শুইয়া পড়িতেছিলেন, হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিলেন, 'বাজল কটা?'

'ও, তোমার আবার আর্লি টু বেড আছে যে! আচ্ছা তবে খেয়েই নাও আগে।' বলিয়া মায়া তাঁহাকে খাওয়াইবার জন্য আসন পাতিয়া জল গড়াইতে বসিল।

'ননীকেও দিলে না কেন?'

'তবেই হয়েছে! একটি খাবারে হাত দেবে না। বসবে আর উঠবে।' বলিয়া সে স্বামীর সুমুখে খাবারের থালা ধরিয়া দিল।

স্বামীর আহারাদি শেষ হইলে মায়া হাসিয়া বলিল, 'এস তোমার 'আর্লি টু বেড করে দিই—এস।'

বলিয়া তেলের বাটি হাতে লইয়া, মুখ টিপিয়া টিপিয়া হাসিতে লাগিল। গুড়গুড়ির নল মুখে দিয়া শশধর শয্যা গ্রহণ করিলেন। মায়া তাঁহার পায়ের উপর মাথা ঠেকাইয়া প্রণাম করিয়া একখানি পা তাহার কোলের উপর সযত্নে ধীরে-ধীরে টানিয়া লইল। সেবা-শুশ্রূষায় মায়ার হাত বড় চমৎকার!

স্বামীর হাত হইতে গড়গড়ার নলটা অনেকক্ষণ খসিয়া পড়িয়াছিল। তাহার পর ঘড় ঘড় করিয়া নাক ডাকিয়া উঠিতেও দেরি হইল না।

মায়া ধীরে-ধীরে আর একটি প্রণাম করিল। কোল হইতে তাঁহার পা-দুইটি নামাইয়া দিয়া অত্যন্ত সন্তর্পণে গায়ের উপর আগাগোড়া লেপ চাপাইয়া দিয়া পা টিপিয়া টিপিয়া উঠিয়া গিয়া ননীমাধবকে বলিল, 'নাও, খুব লেখাপড়া হয়েছে। তোল এবার তোমার এ-সব।' ননীমাধব তাহার মুখের পানে তাকাইয়া দোয়াত-কলম তুলিয়া রাখিল। পাশের ঘরে রোজ যেমন হয়, সেদিনও তেমনি ননীমাধবের বিছানা পাতা হইয়াছিল।

আহারাদির পর শোবার ঘরে ঢুকিয়াই ননীমাধব বলিল, 'আমি আজ পটলাদের বাড়িতে শোব।'

মায়া একটু বিস্মিত হইয়া গিয়া স্মিতহাস্যে তাহার মুখের উপর একাগ্র দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া কহিল, 'কেন?' কিন্তু এ 'কেন'র জবাব সে দিতে পারিল না। ননীমাধব মাথা নত করিয়া সেই-খানেই দাঁড়াইয়া রহিল।

মায়া তাহার জবাবের অপেক্ষা করিল না। বাঁ হাত বাড়াইয়া তাহার হাত ধরিয়া একরকম জোর করিয়াই তাহাকে বিছানার উপর বসাইয়া দিল। বসাইয়া চুপিচুপি বলিল, 'পাগল!' শয্যা-প্রান্তে ননীমাধব নিঃসাড় নিস্পন্দভাবে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া পড়িয়া রহিল।

জানালাটা বন্ধ করা হয় নাই। মৃদু জ্যোস্নালোকের একটি সুদীর্ঘ রেখা বাতায়ন-পথ অতিক্রম করিয়া গৃহের অপর প্রান্তে আসিয়া পড়িয়াছে। বাহিরে হিমাচ্ছন্ন জ্যোৎস্নাময়ী রাত্রি। নিস্তব্ধ নিসুপ্ত গ্রাম। নিদ্রিত গৃহস্বামীর নাসিকাধ্বনি ছাড়া আর কোথাও কোনও শব্দ পর্যন্ত শোনা যায় না।

পরদিন হইতে ননীমাধবের মাথার ভিতরটা কেমন যেন সকল সময়েই ঝিম ঝিম করিতে থাকে। মুখ তুলিয়া কথা কহিতে পারে না। চব্বিশঘণ্টা বাহিরে বাহিরেই কাটায়।

কিন্তু মায়া তাহাকে এমন করিয়া কিছুতেই থাকিতে দিবে না। আদর যেন তাহার আরও শতগুণ বাড়িয়া চলে। একটুখানি ফাঁকা পাইলেই হাসিয়া কাছে আসিয়া দাঁড়ায়।

মালতী, চঞ্চলা, সখী, বাসন্তী, তাহারা যদি-বা পথে ছিল, তাহারই সমবয়সী, খেলার সাথী। কিন্তু এখানে কেমন যেন তাহার ভয়-ভয় করিতে থাকে। অপরাধ বলিয়া মনে হয়। স্নেহ-ভালবাসা জীবনে যাহারা পায় না, বেশি পাইলে তাহারা তাহা সহ্য করিতে পারে না। তাই বোধহয় হঠাৎ একদিন দেখা গেল,

কাহাকেও কিছু না বলিয়া ননীমাধব সেখান হইতে পলায়ন করিয়াছে।

কে যে এই হতভাগার জীবন লইয়া এমন খেলা খেলিল জানি না। এতদিন তাহার কোন খবর পাওয়া যায় নাই। হঠাৎ দেখা গেল, রেলওয়ে কোম্পানীর ছোট্ট একটি ব্র্যাঞ্চ লাইনে চলন্ত একটি ট্রেণের কামরায় ননীমাধব বসিয়া আছে। চোদ্দ বছরের ননীমাধবের বয়স তখন প্রায় তিরিশের কাছাকাছি। তাপস বালকের মত দেহে তাহার সে সুকুমার সৌন্দর্য আর নাই, চোখে-মুখে কেমন যেন একটা রুক্ষ ভাব, মাথায় উস্কো-খুস্কো অগোছালো চুল, পরনে খাকি রংএর আধা-পায়জামা, গায়ে কামিজের উপর কোট, পায়ে জুতা-মুজা দুই-ই।

এতদিন কেমন করিয়া যে তাহার জীবন কাটিয়াছে কে জানে। দেখিলে মনে হয়, অনেক ঝড়ঝঞ্ঝা তাহার মাথার উপর দিয়া পার হইয়াছে কিন্তু সে পল্লী-কিশোরের অটুট স্বাস্থ্যের এতটুকু হানি করিতে পারে নাই।

কামরায় আরও দুজন যাত্রী, দুজনেই স্ত্রীলোক। তের-চোদ্দ বছরের একটি মেয়ে সুমুখের বেঞ্চে তাহারই দিকে মুখ ফিরাইয়া শুইয়া আছে। পাশের বেঞ্চে, বোধকরি ওই মেয়েটিরই মা, আগাগোড়া মুড়ি দিয়া সম্ভবত ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন।

ব্র্যাঞ্চ-লাইনের ট্রেন। কামরার মাথার উপরে অনুজ্জ্বল একটি আলো মিট মিট করিয়া জ্বলিতেছিল। তাহারই সেই স্তিমিত আলোক-শিখায় দেখা গেল, ছোট সেই ঘুমন্ত মেয়েটির গলায় হার, হাতে চুড়ি, কানে দুল! দুল দুটি বোধকরি হীরার। নইলে ওই সামান্য আলোকে অমন আগুনের মত জ্বলিবে কেন? ননীমাধব তাহার মুখের পানে না তাকাইয়া ঘন-ঘন সেই জ্বলন্ত দুটি দুলের পানে তাকাইতেছিল। হঠাৎ কি মনে হইল কে জানে, ননীমাধব ধীরে ধীরে বেঞ্চের এক কোনের দিকে সরিয়া গিয়া অত্যন্ত সন্তর্পণে সেইদিকে হাত বাড়াইল।

হাত বাড়াইল বোধ করি খুলিয়া লইবার জন্যই। হাত তাহার এতটুকু কাঁপিল না। গত দশ-পনের বৎসর ধরিয়া এই কর্মেই সে শুধু অভ্যস্ত হইয়াছে কিনা তাই-বা কে জানে! কিন্তু আধ-আলো আধ-অন্ধকারে হয়ত ঠিক ঠাহর হয় নাই, ঠাণ্ডা হাতের স্পর্শ পাইবামাত্র মেয়েটি ধীরে ধীরে চোখ চাহিল। ননীমাধব তাহার হাত তখন সরাইয়া লইয়াছে।

মেয়েটি চীৎকার করিল না, মুখে একটি কথাও বলিল না; ননীমাধবের মুখের পানে একবার মাত্র তাকাইয়া ধীরে-ধীরে উঠিয়া বসিল। তাহার পর গায়ের কাপড়টি ভাল করিয়া জড়াইয়া লইয়া আস্তে আস্তে পাশের বেঞ্চে উঠিয়া গিয়া মায়ের গায়ে হাত দিয়া ডাকিল, 'মা!'

ননীমাধব জিজ্ঞাসা করিল, 'ও তোমার মা বুঝি?'

মেয়েটি নিঃসঙ্কোচে ননীমাধবের দিকে মুখ ফিরাইয়া ঘাড় নাড়িয়া বলিল, 'হুঁ।'

মা ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিয়াই চীৎকার শুরু করিলেন, 'নাম, নাম মা গৌরী, নেবে পড় চট করে।—ওমা, গাড়ী যে চলছে দেখি, ছেড়ে এল নাকি আমাদের ইষ্টিশান?' মায়ের ছটফটানি দেখিয়া গৌরী না হাসিয়া থাকিতে পারিল না। ঈষৎ হাসিয়া বলিল, 'না মা, তুমি উঠে বস। আমার ভয় করছে।'

'সোনারডি আসেনি, তুই দেখেছিস ত ঠিক?' বলিয়া মা একটুখানি আশ্বস্ত হইয়া চাপিয়া বসিলেন। ঘুমের ঘোরে ননীমাধবকে এতক্ষণ তিনি দেখিতে পান নাই, এইবার হঠাৎ তাহার দিকে নজর পড়িতেই বলিয়া উঠিলেন, 'ওমা, এ যে একটা সাহেব লা! আ-মর, এত গাড়ী থাকতে আর জায়গা পাওনি মুখপোড়া?'

ননীমাধব হাসিয়া বলিল, 'না মা, আমি সাহেব নই, আপনারা কোথায় যাবেন মা?'

মা একটুখানি অপদস্থ হইয়া পড়িলেন। 'ওমা, তুমি আমাদেরই যে! আমরা যাব বাছা অনেক দূর। মুখপোড়া বললাম, কিছু মনে করনা বাছা!'

'না না, ছেলেকে মুখপোড়া বলেছেন, তাতে আর হয়েছে কি!'

ননীমাধব কথা শিখিয়াছে ভাল। মার প্রাণ একেবারে গলিয়া জল হইয়া গেল। আহা, দিব্যি ছেলেটি ত! মা জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কোথায় যাবে বাছা তুমি?'

ননীমাধব বলিল, 'আমি যাব না কোথাও। এমনি ঘুরে বেড়ানই আমার কাজ।'

মা বলিলেন, 'আমরা বাছা কি কুক্ষণেই যে বাড়ী থেকে বেরিয়েছিলাম, আসবার সময় টেরেণ ফেল হল। গিয়েছিলাম আজিমগঞ্জ গঙ্গাচান করতে···বাড়ী থেকে গরুর গাড়ী আসবার কথা। ও-বেলায় এসে একবার ফিরে গেছে, এ-বেলায় যদি না আসে ত কি যে হবে বাবা, তাই ভাবছি।'

ননীমাধব জিজ্ঞাসা করিল, স্টেশন থেকে বাড়ী আপনাদের কতদূর মা?'

'অনেকদূর বাছা,—দু কোশ। আর এই অন্ধকার রাত, আর এই মেঘ করে আছে, আর যদি কখনও বাড়ী থেকে বেরই ত এই—। গৌরী তুইও কান মল!' বলিয়া তিনি সত্য সত্যই কানে হাত দিলেন।

গৌরী হাসিল। ননীমাধরও না হাসিয়া থাকিতে পারিল না।

'হাসি নয় বাছা, বুক আমার দুর-দুর করছে। এই রাত্তির কাল, সঙ্গে সোমত্ত মেয়ে, আর মেয়ের গায়ে এক-গা গয়না।' বলিয়া তিনি মেয়ের মুখের পানে তাকাইয়া বলিলেন, 'গয়না-টয়না খুলে ফেল বাছা, কাপড়ের একটা পুঁটলিতে না হয় বেঁধে নিই।'

গৌরী একবার মায়ের দিকে, একবার ননীমাধবের দিকে তাকাইয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। গা হইতে গহনা খুলিল না।

চলন্ত গাড়ীর শব্দে কথা বলিবার বোধকরি সুবিধা হইতেছিল না মা তাই ও-বেঞ্চ হইতে এ-বেঞ্চে উঠিয়া আসিলেন। 'আমার অভাব কিছু নেই বাছা, ঘর-বাড়ী জমি-জায়গা গাই-গরু আমার যেমন আছে গাঁয়ে তেমনটি আর কারও নেই। নেই শুধু সেই কথায় বলে, 'আছে সবই বিন্দাবনে—আঁধার শুধু কিষ্ট বিনে।' বলিয়াই তিনি

চোখ বুজিয়া, ঢোঁক গিলিয়া, হাত উল্টাইয়া গম্ভীরভাবে বসিয়া রহিলেন।

ননীমাধব জিজ্ঞাসা করিল, 'আপনি একা এলেন কেন? সঙ্গে একটা বেটা-ছেলে—'

কথাটা তাহাকে তিনি শেষ করিতে দিলেন না। মাঝখানেই কথা বলিলেন। কিন্তু কণ্ঠস্বর তখন তাঁহার ভারি হইয়া উঠিয়াছে। বলিলেন, 'সেই কথাই বলছি বাছা, আমার মত অভাগীর কি আর বেঁচে থাকা সাজে, না মুখ দেখাতে হয়! এই ঠিক তোমার মতন একটি, তোমার চেয়ে ডাগর একটি, আর একটি তোমার চেয়ে ছোট, এই তিন-তিনটিকে দিয়ে এসেছি বাছা শ্মশান-ঘাটে তুলে। ছেলে ত নয়—যেন রাজপুত্তুর।' বলিতে বলিতে ঠোঁট দুইটি তাঁহার থর থর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। চোখ দিয়া টস টস করিয়া জল গড়াইতে লাগিল। মিনিটখানেক পরে একটুখানি সামলাইয়া লইয়া তিনি গৌরীর দিকে আঙুল বাড়াইয়া বলিলেন, 'এখন বাছা ওই আমার পুঁজি। থাক মা থাক, তুই ওইখানেই বসে থাক। কোনও ভয় নেই। ছেলেটি বড় ভাল ছেলে। হ্যাঁ বাবা, তোমার নামটি কি?'

'আমার নাম ননীমাধব।'

মা বলিলেন, 'ননীমাধব? আমার একটির নাম ছিল সুবোধ, একটির নাম ছিল রাখাল, আর একটির নাম ছিল গোপাল।'

বলিয়া ছেলে-তিনটিকে মনে পড়িতেই বোধকরি তিনি কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন। তাহার পরে বলিলেন, 'এই যে তুমি মা মা বলে ডাকছ বাছা, আমার বুকের ভেতরটা কেমন হু হু করে উঠছে। মনে হচ্ছে, রাখাল আমার বেঁচে আছে। তুমি বাবা আমার ঠিক রাখালের মত দেখতে।'

দেখিতে দেখিতে গাড়ী আসিয়া সোনারডি স্টেশনে পৌঁছিল। গাড়ী থামিতে না থামিতেই মা জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কোন ইষ্টিশান বাবা?'

ননীমাধব জানালার পথে মুখ বাড়াইল, কিন্তু স্টেশনে না আছে

লোক, না আছে আলো, অন্ধকারে ভাল করিয়া কিছু ঠিক-ঠাহর করা যায় না।

গৌরী যেদিকে বসিয়াছিল, প্ল্যাটফর্ম্ম সেইদিকে। গৌরী বলিয়া উঠিল, 'সোনারডি। মা, তুমি নাম আগে।'

একহাতে কাপড়ের একটা বোঁচকা, আর একহাতে একটা ঘটি লইয়া মা তখন উঠিয়া দাঁড়াইয়াছেন। বলিলেন, 'জানিস ত ঠিক? মিনসেরা হুটো আলোও জ্বেলে রাখে না গা!'

গৌরী তাড়াতাড়ি করিতেছিল, 'আমি দেখেছি মা, আলোর গায়ে লেখা রয়েছে, তুমি নাম চট করে।'

ননীমাধব উঠিয়া আসিয়া দরজা খুলিয়া দিয়া মার হাত হইতে ঘটি ও বোঁচকা কাড়িয়া লইয়া বলিল, 'নামুন ধীরে-ধীরে। তুমিও নাম গৌরী।'

মা ও গৌরীকে নামাইয়া দিয়া, ঘটি বোঁচকা নামাইয়া, ননীমাধব জিজ্ঞাসা করিল, 'আর-কিছু আছে আপনাদের?'

'না বাবা, কিচ্ছু নেই। গৌরী, তোর সেই খাগ্‌ড়াই গেলাসটি?' বলিয়াই আর জবাবের অপেক্ষা না করিয়া মা বলিলেন, 'কিন্তু তুমি বাবা—হ্যাঁ বাবা, কতদূর যাবে বাবা ননী, তোমার মা আছে ত?'

সে-কথার কোনও জবাব না দিয়াই ননীমাধব তাহার কাগজে-মোড়া পোঁটলাটি হাতে লইয়া গাড়ী হইতে নামিয়া পড়িল। সেইখানেই হেঁট হইয়া একটি প্রণাম করিয়া মায়ের পায়ের ধূলা মাথায় লইয়া ননীমাধব বলিল, 'না মা, মা আমার নেই।'

'আ আমার কপাল! আহা বাছারে, মা নেই তোমার?'

বলা তখনও শেষ হয় নাই, এমন সময় সিটি দিয়া গাড়ী ছাড়িয়া দিল। মা তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিলেন, 'গাড়ী যে ছেড়ে দিলে ননী—? 'তুমি ওঠ।' কথাটা মার মুখের মধ্যে যেন আটকাইয়া রহিল।

নিতান্ত উদাসীনের মত ননীমাধব সেই চলন্ত ট্রেনের দিকে একবার তাকাইল মাত্র। বলিল, 'চলুন, আপনাদের পৌঁছে দিয়ে আসি।' আনন্দের আতিশয্যে মার মুখ দিয়া আর কথা বাহির

হইল না। গরুর-গাড়ীর কথা, অন্ধকার এতখানি পথের কথা, এতক্ষণ তিনি ভূলিয়াই গিয়াছিলেন। বলিলেন, 'তোমায় কি বলে যে আশীর্বাদ করব বাবা!' বলিয়াই তিনি প্রাণপণে চীৎকার করিতে লাগিলেন, 'বংশী! বংশী! আমাদের বংশী এসেছিস? রাজিবপুরের বংশী এখানে কেউ আছিস বাবা?'

অদূরে কয়েকজন গাড়োয়ান গাড়ী খুলিয়া দিয়া শুকনো খড় জ্বালাইয়া আগুন পোহাইতেছিল। তাহাদের কে একজন বলিয়া উঠিল, 'উহু, বংশী ত নেই মা, গোপালগঞ্জের বলরাম আছে।'

গাড়ী তাঁহার আসে নাই। ননীমাধব বিস্তর হাঁক-ডাক করিয়া গাড়ীর সন্ধান করিতে লাগিল।

শেষে অনেক কষ্টে অনেক খোঁজাখোঁজির পর সংবাদ পাওয়া গেল যে, স্টেশনের একজন খালাসীর নাকি একজোড়া গাড়ী আছে, অসময়ে বেশি ভাড়া পাইলে সে নাকি ট্রেনের যাত্রীদের বাড়ী পৌঁছাইয়া দেয়।

ননীমাধবের সাহেবী পোশাক দেখিয়া স্টেশন-মাস্টার স্বয়ং সুপারিশ করিলেন। লোকটা তৎক্ষণাৎ তাহার গাড়ী জুড়িয়া আনিয়া বলিল, 'চলুন হুজুর!' ননীমাধবকে আশীর্বাদ মার যেন আর ফুরাইতে চায় না।

খানিকক্ষণ পরে বলিলেন, 'তোমার ওই সায়েবের মতন ওইগুলো তুমি খোল বাছা, আমার বড় ভয় করে।'

ননীমাধব হাসিতে লাগিল। 'খুলব মা খুলব। বাড়ী গিয়েই খুলে ফেলব এসব।'

তাহার পর সারা রাস্তা ধরিয়া মা তাহাকে কত কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। সত্যে মিথ্যায় জড়াইয়া কোনও প্রশ্নেরই জবাব দিতে সে কসুর করিল না। জায়গা-জমি বাড়ী-ঘর সবই আছে, কিন্তু মা নাই, বাবাও মরিয়াছেন, আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে—আছে এক মামীমা। মামার বিষয়-সম্পত্তি বিস্তর, প্রকাণ্ড জমিদারী, লাখ লাখ টাকা। মামীমা তাহাকে বিবাহ করিয়া ঘর-সংসারী হইতে বলেন, কিন্তু বিবাহ সে

এখন করিতে চায় না, তাই এমন করিয়া পালাইয়া পালাইয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়ায়।

মা তাহার কথা শুনিতেছিলেন, সঙ্গে সঙ্গে ইহাও ভাবিতেছিলেন যে, ছেলেটিকে এত রাত্রে বাড়ী লইয়া গিয়া তিনি কি খাইতে দিবেন। কথা শেষ হইলে গৌরীর মুখের পানে তাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কলা কি রাতের বেলা পাড়তে নেই নাকি মা?'

গৌরী বোধকরি অন্যমনস্ক ছিল, কথাটা সে ভাল বুঝিতে পারিল না। বলিল, 'কী মা? কি বললে?'

'রাত্তিরকালে গাছ থেকে কলার কাঁদি কাটলে কিছু হয় নাকি গৌরী?'

গৌরী বলিল, 'হ্যাঁ মা, সেই যে কুষ্টোব্যাধি না কি হয়, তুমিই ত একদিন বলেছিলে।'

'তবে কাজ নেই মা।' বলিয়া মা চুপ করিলেন।

মাকে সবাই গৌরীর মা বলিয়া ডাকে। আগে বোধকরি সুবোধের মা বলিত।

সবাই বলে, 'মাগী বকে একটুখানি বেশি, নইলে অমন সাদাসিধে ভাল মানুষ সত্যি দেখা যায় না।'

আজকাল মুখে তাঁহার ননীমাধবের কথা ছাড়া আর কথাই নাই। বলেন, 'অমন ছেলে আর দুটি হয় না। আমি আমার রাখালকে ফিরে পেয়েছি।' বলেন, 'আহা, মা নেই ছেলেটির। মামী খুব বড়লোক। দুয়রে হাতী বাঁধা।'

ননীমাধব যাই-যাই করে। মায়ের চোখ তখন জলে ভরিয়া আসে। বলেন, 'আর দুটি দিন বাছা।'

দুটি দিন দুটি দিন করিয়া ননীমাধবের আর যাওয়াই হয় না।

মাসখানেক পরে হঠাৎ শোনা গেল, ননীমাধবের সঙ্গে গৌরীর নাকি বিয়ে। গ্রামের লোক ত অবাক! যেমন ছেলে তেমনি

মেয়ে! সবাই বলে, 'ভগবানের দেওয়, এমনি করেই জোটে। নইলে কোথায় তীথি করতে গিয়ে পথে দেখা!'

পাড়ার দু-একজন হিতৈষিনী আসিয়া জিজ্ঞাসা করে, 'ছেলেটির খোঁজ-খবর সব নিয়েছিস ত গৌরীর মা? বরের আপন-জন কেউ এল না যে এখনও?'

গৌরীর মা চোখ-মুখের ইশারায় তাহাদের একটুখানি দূরে লইয়া গিয়া হাত নাড়িয়া বলেন, 'চুপ চুপ! লুকিয়ে বিয়ে হচ্ছে মা, লুকিয়ে। জানাজানি হলে কি আর রক্ষা আছে! আমার মতন অমন সাতটা গৌরীর মা ওদের দাসী-বাঁদীর যুগ্যি।'

সেই এক কথা, বলেন, 'মামীর দুয়রে হাতী বাঁধা।'

অজানা ছেলেটির ঠিক-ঠিকানা না জানিয়া বিবাহ দেওয়া, কেহ কেহ বলিতে লাগিল, 'নিজের ছাগল কেউ যদি মাথার দিকটা না কেটে লেজের দিকে কাটে ত তোমারই-বা কি, আমারই-বা কি! নিজের মেয়ে, যা-খুশী তাই করুক না বাপু!'

কিন্তু মুরুব্বি-মাতব্বরেরা ছাড়িলেন না। তাঁহাদেরও দু-একজন গৌরীর মাকে নিভৃতে ডাকিয়া লইয়া গিয়া প্রশ্ন করিলেন।

গৌরীর মা তাঁহাদেরও ঠিক সেই এক কথা বলিয়াই চুপ করাইয়া দিলেন। 'আমার তিনকাল গিয়ে এককালে ঠেকল, আর, আমি বুড়ী মাগী কিনা না জেনে-শুনেই—কি যে বল তোমরা।'

যাই হক, কাহাকেও কিছু বলিতে হইল না।

খুব খানিকটা ধুমধামের সঙ্গে পরের মাসের তেসরা তারিখে শুভকার্য নির্বিঘ্নেই সুসম্পন্ন হইয়া গেল।

গৌরী তাহার প্রতিবেশিনী সঙ্গিনীদের সঙ্গে হাসিয়া খেলিয়া ঘুরিয়া বেড়ায়, আর বাড়ী ঢুকিয়াই কেমন যেন লজ্জিত সংকুচিত হইয়া ওঠে।

মা বলেন, 'আ আমার কপাল! বসে বসে দুদণ্ড কথা ক'মা তোরা! দরজার ফুটো দিয়ে দেখি, দেখে হিয়ে জুড়ক!'

গৌরী মুচকি মুচকি হাসে। হাসিয়া যেন সে লজ্জায় আরও বেশি জড়সড় হইয়া যায়। রাত্রে সঙ্গিনীরা তাহাকে জোর করিয়া ঠেলিতে ঠেলিতে ননীমাধবের ঘরে পৌঁছাইয়া দিয়া আসে।

গৌরী সেই-যে বিছানার একপাশে মুড়িসুড়ি দিয়া শুইয়া পড়ে একটিবাবের জন্যও আর মুখ তুলিতে পারে না।

ননীমাধব বলে, 'কি গো লজ্জাবতী, লজ্জার যে সীমা নেই দেখছি।' গৌরী মুখও তোলে না, কথাও বলে না। অথচ বিবাহের পূর্বে কথা সে তাহার সঙ্গে কতবার বলিয়াছে।

ননীমাধব একবার উঠিয়া গিয়া বাহিরে দেখিয়া আসে, কেহ আড়ি পাতিয়াছে কিনা, তাহার পর ফিরিয়া আসিয়া বলে, 'না কেউ নেই।' ডাকে, 'গৌরী!' লেপের তলা হইতে গৌরী সাড়া দেয়। —'উঁ!'

'তাই ত বলি।' বলিয়া ননীমাধব হাসে।

গৌরী ধীরে-ধীরে লেপের তলা হইতে মুখ বাহির করিয়া বলে, 'আজ এমন মজা হল! মা বলে তোরা দুজনে কথা ক'—আমি দেখি।' বলিয়া ফিক ফিক করিয়া হাসিতে হাসিতে আবার লেপের নিচে মুখ লুকায়। দুষ্টুমি করিয়া ননীমাধব লেপটা তুলিয়া ধরে।

গৌরী হাসিয়া বলে, 'বা—রে! আমার শীত করে না?'

ননীমাধব তাহার মুখের পানে একদৃষ্টে তাকাইয়া থাকে। বলে, 'করুক। কিন্তু তোমার ও দুল-জোড়াটি খুল না যেন। চমৎকার মানায়।'

এই দুলের প্রসঙ্গে গৌরী আর কথা বলে না, চুপ করিয়া কি যেন ভাবে।

'চুপ করে রইলে যে?'

'কি বলব?'

জবাবটা ননীমাধবের ভাল লাগে না। বলে, 'তোমার কি মনে হয়? ট্রেণে সেদিন তোমার ও-দুটো আমি চুরি করতে চেয়েছিলাম?'

গৌরী এবার কথা কহিল। বলিল, 'তা না ত কী?'

'তোমার তাই বিশ্বাস?' গৌরী ঘাড় নাড়িয়া 'হুঁ' বলিয়া সরিয়া সরিয়া লেপের তলায় গিয়া ঢোকে।

কথাটা চাপা দিবার জন্য ননীমাধব অন্য কথা পাড়িতে চেষ্টা করে কিন্তু সব তাহার বিফল হইয়া যায়। গৌরী চুপ করিয়া থাকে, ননীমাধবেরও আর ঘাঁটাঘাঁটি করিতে ইচ্ছা হয় না। ইচ্ছা না হইলেও গৌরীর এই বিশ্বাসের কথাটা তাহার মনের মধ্যে কেমন যেন নিষ্ঠুরভাবে চাপিয়া বসে। অনেকক্ষণ ধরিয়া ওই কথাটাই মনের মধ্যে ঘোরা-ফেরা করে! রাত্রে ভাল ঘুম হয় না।

এমনি করিয়া নব-পরিণীত বর-বধূর প্রেমালাপের সূত্র কোথায় যেন ছিন্ন হইয়া যায়।

সেদিন রাত্রে কথাবার্তার মাঝখানে ননীমাধব হঠাৎ বলিয়া বসিল, 'আমার কি ইচ্ছে করে জান গৌরী, আমি কোথাও কোন দূরদেশে চলে যাই। তুমি চিঠিপত্র লিখবে, আমি তার জবাব দেব। আবার তুমি লিখবে, আবার আমি লিখব। এমনি করে আমাদের চিঠি লেখালেখি চলবে, তারপর হঠাৎ একদিন আমি এসে হাজির হব। কেমন?'

গৌরী ঘাড় নাড়িয়া বলিল, 'হ্যাঁ।'

ননীমাধব জিজ্ঞাসা করিল, 'আমি কাছে থাকব না, তোমার মন কেমন করবে না?'

এবারেও গৌরী ঘাড় নাড়িয়া বলিল, 'হ্যাঁ, করবে।' বলিয়াই একটুখানি থামিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'কোথায় যাবে?'

'যাব না কোথাও। এমনি বলছিলাম। যদি যাই—'

গৌরী তাহার মুখের কাছে মুখ লইয়া গিয়া বলিল, 'না, তুমি যেও না।'

কথাটা অন্যদিকে চলিয়া যায় দেখিয়া ননীমাধব কহিল, 'যাচ্ছি আর কোথায়! যাব না। কিন্তু ধর, যদি যাই, তুমি ত ভাল লিখতে পড়তে জান না, চিঠি তুমি কাকে দিয়ে লেখাবে?'

গৌরী তাহার চক্ষু স্থির করিয়া একটুখানি ভাবিয়া বলিল, 'কেন, মিনিকে দিয়ে।'

'মিনি কে?'

'আ, জানে না যেন! সেই যে তোমায় 'কাত্তিক' বলে ডাকে, সেই যে কানে বটফল আছে, নাকে চিড়িতন।'

ননীমাধব বলিল, 'ও। সে ত লিখতে ভাল জানে না, আমি দেখেছি।'

গৌরী সত্যই চিন্তিত হইয়া পড়িল। বলিল, 'তবে—তবে, ওই জিতুকে দিয়ে।'

'জিতু কে?'

'মিনির ভাই গো। ওইটুকু ছেলে, থার্ড ক্লাসে পড়ে।'

'হুঁ।' বলিয়া ননীমাধব সহসা গম্ভীর হইয়া পড়িল।

এবং তাহাকে চুপ করিয়া থাকিতে দেখিয়া গৌরীর কি যে মনে হইল কে জানে, বলিল, 'ওগো, তোমার গিয়ে কাজ নেই।'

ননীমাধব নিষেধ করে। বলে 'তুমি ছেলেমানুষ নও। তুমি যেও না ওদের সঙ্গে। পাড়ার মেয়েগুলো ভাল নয়।'

গৌরী ভাবে, কথাটার প্রতিবাদ করে। কিন্তু প্রতিবাদ সে করিতে পারে না। মুখ বুজিয়া চুপ করিয়া থাকে।

ননীমাধব বলে, 'চুপ করে রইলে যে?'

ঘাড় নাড়িয়া গৌরী বড় দুঃখেই জানায়, 'বেশ, যাব না তাহলে।'

সঙ্গিনীরা দুপুরে ডাকিতে আসে। গৌরী বলে, 'না ভাই, এই-খানেই খেলা করি আয়।'

মিনি বলে, 'কেন লা? বাড়ি ছেড়ে আর বুঝি তোর নড়তে ইচ্ছে করে না?'

গৌরী লজ্জিত হইয়া হাসিয়া বলে, 'ধেৎ! তা কেন?'

'তবে আর কি, চল!' বলিয়া মিনি তাহাকে একরকম জোর করিয়াই ধরিয়া লইয়া যায়।

পথ চলিতে চলিতে মিনিকে সে একটুখানি দূরে লইয়া গিয়া কাঁধে হাত দিয়া চুপি-চুপি বলে, 'ও ভাই বারণ করেছে।'

মিনি বলে, 'ও মা গো! কেন, আমরা কি তোকে খেয়ে ফেলব নাকি?'

গৌরীও বলে, 'কে জানে ভাই, কি রকম যে মানুষ!'

কথাটাকে মিনি তেমন গ্রাহ্যই করে না। বলে, 'হ্যাঁ, ও যেন দেখতে আসছে। চল!'

ননীমাধব আবার আর-একদিন বারণ করে, 'বললাম, তবু শুনলে না ত?'

কথাটা গৌরীর মনেই ছিল না। বলিল, 'কী?'

'ভুলে গেছ? তা যাবে বই কি।'

গৌরী মনে করিবার চেষ্টা করিতে থাকে। বলে, 'ও, সেই কথা। আচ্ছা আর যাব না, দেখ।'

দুদিন সত্যই সে যায় না। তিন দিনের দিন সে এক ভারি মজার ব্যাপার! কোথা হইতে এক দল বিদেশী ভ্রমণকারী আসিয়া সমস্ত গ্রামখানাকে একেবারে ছাইয়া ফেলিয়াছে।

পুরুষেরা সর্বাঙ্গে ছাই মাখিয়া মাথায় জটা পরিয়া হাতে কমণ্ডলু লইয়া সাধু সাজিয়া বাড়ি-বাড়ি ভিক্ষা করিয়া বেড়ায়, আর রং-বেরংএর ঘাঘরা-পরা মেয়েগুলা সারা দুপুরবেলাটা তাহাদের গ্রামখানিকে গুলজার করিয়া রাখে। কেহ-বা বুড়া-বুড়ীদের বাতের ঔষধ দেয়, ধনেশ পাখীর তেল বিক্রয় করে, কেহ-বা স্বামী বশ করিবার সিঁদুর দিতে চায়, কেহ-বা শত্রু দমন করিবার মন্ত্র জানে, কেহ-বা পুত্র-হীনা নারীর বন্ধ্যাত্ব ঘুচাইতে পারে, কেহ-বা বিড় বিড় করিয়া মন্ত্র পড়িয়া চোখের সুমুখে অদ্ভুত সব খেলা-তামাশা দেখাইয়া বেড়ায়।

মিনি বলিল, 'চল ভাই দেখে আসি।'

গৌরীর ইচ্ছা ছিল ষোল-আনা, তবু সে ভয়ে-ভয়ে বলিল, 'না ভাই—।'

'আ-মর। ছুঁড়ী ভয়েই মলো।'

গৌরী কি যে বলিবে, কি যে করিবে, কিছুই বুঝিতে পারিল না। মিনির মুখের পানে ফ্যাল ফ্যাল করিয়া তাকাইয়া রহিল।

মিনি বলিল, 'চল ভাই চল, দেখতে ত পাবে না, জিজ্ঞেস করে ত বলবি, যাইনি। বাস, ফুরিয়ে গেল।'

পরামর্শ মন্দ নয়। গৌরী বলিল, 'চল তবে।'

এ-বাড়ি সে-বাড়ি ঘুরিয়া ঘুরিয়া তাহারা শেষে অনেক কষ্টে সুরেশীদের বাড়ি গিয়া দেখে, গোলাপী রঙের ঘাঘরা-পরা একটি মেয়ে তাহার তল্পী-তল্পা খুলিয়া ভেলকি-বাজি দেখাইতে শুরু করিয়াছে। হাতে কিছুই নাই, দেখিতে দেখিতে মন্ত্র পড়িয়া ফুঁ দিতেই টাকা বাহির হয়, টাকা হঠাৎ মার্বেলের গুলির আকার ধারণ করে, মার্বেলের গুলি অদৃশ্য হইয়া গিয়া একটা পুতুল হয়, আবার পুতুল উড়িয়া গিয়া ক্রমাগত ডিম বাহির হইতে থাকে। কোথা হইতে আসে এবং কোনদিক দিয়া যে উড়িয়া যায়, কিছুই টের পাইবার উপায় নাই। তাহার পর, এমনি করিয়া একটির পর একটি কত রকমের কত অদ্ভুত খেলা দেখান চলে।

অবাক হইয়া সকলে সেই বিদেশী মেয়েটার মুখের পানে হাঁ করিয়া তাকাইয়া থাকে। দু-একটা মেয়ে তাহার কৌশল ধরিয়া ফেলিয়া তাহাকে জব্দ করিবার চেষ্টা করে, কিন্তু না পারিয়া শেষে নিজেরাই অপদস্থ হইয়া সরিয়া দাঁড়ায়।

মিনি বলিল, 'কেমন! আসতে চাইছিলি না যে!'

গৌরী বলিল, 'হ্যাঁ ভাই।'

ঘুরিয়া ফিরিয়া ইহার-উহার বাড়িতে গল্প করিয়া যখন তাহারা বাড়ি ফিরিল, তখন প্রায় সন্ধ্যা।

রাত্রে ননীমাধব জিজ্ঞাসা করিল, 'গিয়েছিলে আজ?'

কি জবাব দিবে বুঝিতে না পারিয়া সে এমনি ভাব দেখাইল, কথাটা যেন সে শুনিতেই পায় নাই। বলিল, 'কী? কোথা?'

গম্ভীরভাবে ননীমাধব বলিল, 'বেড়াতে?'

অম্লানবদনে গৌরী ঘাড় নাড়িয়া বলিয়া ফেলিল, 'না।'

ননীমাধব আর কোনও কথা জিজ্ঞাসা করিল না।

ফাল্গুন মাসে মিনির বিয়ে।

'হ্যাঁগা, মিনি আমার অতদিনের বন্ধু, ওর বিয়ে দেখতে যাব ত? তা যদি না যেতে দাও তাহলে ভারি অন্যায় হবে কিন্তু।'

ননীমাধব বলিল, 'আমি কি তোমায় বেঁধে রেখেছি?'

গৌরী বলিল, 'তাই আমি বলছি বুঝি?'

ননীমাধব চুপ করিয়া রহিল।

গৌরী তাহার ভয়ে কিছুক্ষণ কথা বলিতে পারিল না। তাহার পর সাহস করিয়া আবার জিজ্ঞাসা করিল, 'যাব ত?'

'যেও, কিন্তু বেশিক্ষণ থেক না যেন।'

'না, তা থাকব না।'

'বাসর জেগ না। দূর থেকে বর দেখবে, দেখেই চলে আসবে।'

গৌরী ঘাড় নাড়িয়া বলিল, 'বেশ।'

অনুমতি পাইয়া গৌরী বর দেখিতে গেল। কথা রহিল, মা নিজে গিয়া তাহাকে লইয়া আসিবেন। মিনি তাহার ছেলেবেলার সঙ্গী। পাড়ার যত মেয়ে সেখানে আসিয়া জুটিয়াছে। কত আমোদ, কত আহ্লাদ! সে-সব ছাড়িয়া সহজে বাড়ি ফিরিতে ইচ্ছা তাহার করিতেছিল না। অথচ মা হয়ত এখনই ডাকিতে আসিবেন। না ফিরিলেও নয়। এত আনন্দের মাঝখানেও তাহার বুকের ভিতরটা কেমন যেন খচ খচ করিতে লাগিল। মনে হইল, বিবাহ যেন তাহার না হইলেই ভাল হইত।

বর-কন্যার হাতে-হাতে বাঁধিয়া দিয়া পুরোহিত মন্ত্র উচ্চারণ করিতেছেন, শুভদৃষ্টি তখনও বাকি, এমন সময়ে লণ্ঠন হাতে লইয়া তাহার মা আসিয়া উপস্থিত। তাঁহাকে দেখিবামাত্র গৌরীর বুকের ভিতরটা কেমন যেন ধক্ করিয়া উঠিল। গৌরীর মা আসিতেই বর্ষীয়সী মেয়েরা তাঁহাকে ঘিরিয়া ধরিল।—'এস মা এস। তুমি না এলে চলে?...'

মা বলিলেন, 'হ্যাঁ মা, আসতাম এতক্ষণ, কিন্তু জামাই রয়েছে ঘরে বাছা, না খাইয়ে শুইয়ে ত আসতে পারি না মা। কই বর দেখি!' ছানলা-তলার একটুখানি দূর হইতে লণ্ঠন তুলিয়া মা বর দেখিলেন।—'ওমা, এ যে বেশ ছেলেটি! আহা, এ যে ঘর-আলো-করা জামাই হয়েছে বাছা। কই, মিনির মা কই?' বলিয়া তিনি পিছন ফিরিতেই পট্টবস্ত্র-পরিহিতা মিনির মা তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিয়া অনুচ্চকণ্ঠে কহিলেন, 'আশীর্বাদ কর মা, আমার মিনি যেন…' কথাটা শেষ হইল না। আনন্দে তাহার কণ্ঠ সহসা রুদ্ধ হইয়া গেল।

ঘরের ভিতর মিনির যত সমবয়সী বন্ধুরা তখন হল্লা করিতেছে। মা ডাকিলেন, 'কই মা গৌরী, আয় বাছা আয়!'

কিছুক্ষণ আগে বোধকরি তাহাদের এই কথাই হইতেছিল। কে একটা মেয়ে যেন বলিয়া উঠিল, 'মাইরি আর-কি!'

গৌরীও বলিল, 'দাঁড়াও না মা একটুখানি। এই একটুখানি। শুভদৃষ্টিটা হয়ে যাক।'

একটি মেয়ে তাড়াতাড়ি ছুটিয়া গিয়া মিনির মাকে খবর দিয়া আসিল।

'তাই নাকি?'—মিনির মা ওদিকের কাজ ফেলিয়া দিয়া ছুটিয়া আসিলেন।—'ওমা সে কি কথা গো! গেলেই হল কি না! যেতে না দিলেই নয়।' বলিয়া হাসিতে হাসিতে তিনি তাঁহাকে সেখান হইতে টানিয়া বাহিরে লইয়া গেলেন।

গৌরীর মাকে ভুলাইতে আর কতক্ষণ! নিতান্ত সহজ সরল ভালমানুষ। বিয়ে-বাড়ির কাজে লাগাইয়া দিবামাত্র বাড়ি ফিরিবার কথা তাঁহার আর মনেই রহিল না। বিবাহ শেষ হইয়া গেল। বরযাত্রীদের খাওয়া-দাওয়া চুকিল।

বাসরের উদ্যোগে মেয়েরা তখন মাতিয়া উঠিয়াছে। গৌরীর মনে পড়িল, বাসরে যাওয়া তাহার নিষেধ। একবার ভাবিল, মাকে লইয়া চুপি-চুপি এই সময়ে সে সরিয়া পড়ে।

সারাদিন উপবাসের পর মিনির মা তখন মিনিকে তাঁহার কোলে বসাইয়া আদর করিয়া নিজের হাতে খাওয়াইয়া দিতেছেন। লাল

চেলি-পরা মিনির কপালে চন্দনের ফোঁটা, সুতা-বাঁধা হাতে একটি রুপার কাজললতা। মিনি তাহার মার কোল হইতে মুখ তুলিয়া ছোট একটা মেয়েকে কাছে ডাকিয়া চুপিচুপি বলিল, 'গৌরীকে ডাক ত সাবু।'

আহা, গৌরীকে সে অনেকক্ষণ দেখে নাই।

গৌরী কাছে আসিয়া বসিতেই লজ্জায় সে মায়ের কোল হইতে নামিয়া বলিল, 'আর খাব না মা।' বলিয়াই সে গৌরীর এক-খানি হাত চাপিয়া ধরিয়া জলভরা চোখে তাহার মুখের পানে একবার তাকাইল। বলিল, 'যাসনে ভাই।'

গৌরী তখন ঝর ঝর করিয়া কাঁদিয়া ফেলিয়াছে।

মিনির মা তাহাকে চুপ করাইলেন।—'ছি মা, আনন্দের দিনে আজ কি চোখের জল...' বলিয়া তাহাকে চুপ করাইতে গিয়া তিনিও মহা বিপদে পড়িলেন। নিজের চোখের জল গোপন করা তাঁহার পক্ষে দুঃসাধ্য হইয়া উঠিল।

মা ও মেয়ে বাড়ি যখন ফিরিল, রাত্রি তখন অনেক হইয়াছে।

মা একবার বলিলেন, 'যা মা, তুই ওপরে যা!'

পা টিপিয়া টিপিয়া গৌরী দোতলায় দিয়া দেখে, ননীমাধবের ঘরের দরজায় ভিতর হইতে খিল বন্ধ। ফিরিয়া আসিয়া বলিল, 'আজ আমি তোমার কাছে শুই মা।'

মা আজকাল মেয়েকে লইয়া শুইতে পান না। বলিলেন, 'বেশ ত, দরজা বন্ধ বুঝি?'

গৌরী চুপ করিয়া রহিল।

পরদিন সকালে ননীমাধব কোনও কথাই জিজ্ঞাসা করিল না। গৌরী ভাবিল, হয়ত এই সামান্য কথা লইয়া সে আর তাহাকে বেশি কিছু বলিবে না। সত্যই বলিল না।

রাত্রে সে মাত্র একবার জিজ্ঞাসা করিল, 'সকালে এসেছিলে?'

ঘাড় নাড়িয়া গৌরী বলিল, 'না, এসেছিলাম রাত্রেই। কি করব বল, কিছুতেই ছাড়ে না, তাই একটুখানি দেরি হয়ে গেল।

এসে দেখি, দরজায় তোমার খিল বন্ধ। মায়ের কাছেই শুয়েছিলাম।'

কিছু না বলিয়া ননীমাধব এমনিভাবে চুপ করিয়া রহিল যে, গৌরীর মনে হইল কথাটা সে বিশ্বাস করে নাই। বলিল, 'মাকে না হয় জিজ্ঞেস করে দেখ।'

ননীমাধব তথাপি নিরুত্তর।

মিনিকে তাহার শ্বশুরবাড়ী পর্যন্ত পৌঁছাইতে গিয়াছিল, মিনির সেই থার্ড-ক্লাসে-পড়া ভাই—জিতু।

সেদিন বৈকালে গৌরী তাহাদের রান্নাঘরের সুমুখের চালায় বসিয়া পান সাজিতেছে, এমন সময় ছুটিতে ছুটিতে জিতু আসিয়া হাজির।

গৌরী তাহাকে দেখিবামাত্র পান সাজা ফেলিয়া হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'ফিরে এলি তোরা? কেমন শ্বশুরবাড়ি রে?'

জিতু তাহার সুমুখে চাপিয়া বসিল। বসিয়া দুই হাঁটুর উপর হাত রাখিয়া দুলিয়া দুলিয়া মিনির শ্বশুরবাড়ির গল্প আরম্ভ করিল। প্রথমেই আরম্ভ করিল, 'দুটো যা কুকুর আছে বাড়িতে—ফাইন! একটা কাল আর একটা কালয়-শাদায়।'

গৌরী কুকুরের গল্প শুনিতে চায় না। জিজ্ঞাসা করিল, 'শ্বশুর-শ্বাশুড়ী আছে কিনা তাই বল আগে।'

'দাঁড়াও বলছি।' বলিয়া কুকুর দুটো যে নূতন মানুষ দেখিলেই চীৎকার করে, এবং তাহাকেও যে দিনকতক অত্যন্ত বিব্রত করিয়া তুলিয়াছিল, প্রথমে সেই কথাই বলিল, পরে জামাইবাবু কেমন করিয়া তাহাদের সঙ্গে তাহার ভাব করিয়া দিলেন, অঙ্গভঙ্গী সহকারে তাহার বিস্তারিত বর্ণনা করিয়া বলিল, 'হ্যাঁ শ্বশুর আছে, শ্বাশুড়ীও আছে।' বলিয়াই জিতু মুখ বাড়াইয়া গৌরীর কানের কাছে চুপি-চুপি বলিল, 'শ্বাশুড়ী-মাগী ভারি বজ্জাত। এমনি উঁচু-উঁচু দাঁত, যেমন কাল, মাগী তেমনি মোটা। দিদিকে আসতে দিচ্ছিল না কিছুতেই। তবে শ্বশুরটা ভাল।'

পানে সুপারি দিতে দিতে গৌরী জিজ্ঞাসা করিল, 'মিনি কাঁদেনি ত সেখানে গিয়ে?'

'বাঃ, কাঁদবে কেন?' বলিয়া আবার সে তাহার কানের কাছে মুখ লইয়া গেল। বলিল, 'জামাই বাবু যে খুব ভালবাসে।'

গৌরীর মুখখানা হঠাৎ লাল হইয়া উঠিল। হাসিয়া বলিল, 'যাঃ! তোকে যেন ওই কথা আমি জিজ্ঞেস করছি।'

জিতু বলিল, 'দিদি তোকে যেতে বলেছে।'

গৌরী হেঁটমুখে পানের খিলি করিতে করিতে ভাবিতে লাগিল, যাইতে সে পারিবে কি না কে জানে।

জিতু ভাবিল, কথাটা সে বিশ্বাস করে নাই। বলিল, 'মাইরি বলছি। যাস যেন।' বলিয়াই হাত বাড়াইয়া একেবারে যতগুলা পান হাতে ওঠে একসঙ্গে ততগুলা তুলিয়া লইয়া জিতু পলায়ন করিতেছিল।

'অতগুলো নিসনে।' বলিয়া হাঁ হাঁ করিয়া গৌরী তাহার হাত হইতে পানগুলা কাড়িয়া লইতে গেল, কিন্তু জিতুও ছাড়িবার পাত্র নয়। ছুজনে টানাটানি ছেঁড়াছেঁড়ি করিতে গিয়া কতক পান ছিঁড়িয়া পড়িল মাটিতে, একটি মাত্র খিলি আসিল গৌরীর হাতে, বাকি গোটা-ছুই পান একসঙ্গে মুখে পুরিয়া দিয়া হাসিতে হাসিতে জিতু ছুটিয়া পলাইল। যাইবার সময় চীৎকার করিয়া বলিয়া গেল, 'যাস যেন।'

ঘাড় নাড়িয়া গৌরী বলিল, 'যাব।'

বলিয়াই সে মুখ ফিরাইতেই উপরের জানালার পানে সহসা তাহার নজর পড়িল। দেখিল, জানালা খোলা, এবং সেই জানালার একটা কপাটের আড়ালে ননীমাধবের সন্দিগ্ধ তীক্ষ্ণ ছুই চক্ষু তাহারই উপর স্থির নিবদ্ধ।

কয়েকদিন পরে শাশুড়ীকে ডাকিয়া ননীমাধব একখানি চিঠি দেখাইল। চিঠিখানি অত্যন্ত জরুরী। লিখিয়াছেন, ননীমাধবের সেই বড়লোক মামীমা। ননীমাধব বলিল, 'বিয়ে করেছি শুনে ভারি খুশী হয়েছেন। আবার দুঃখুও করেছেন - একটুখানি।

লিখেছেন, বৌ নিয়ে তুই আমার এই চিঠিখানি পাবামাত্র আসিস যেন। না এলে কিন্তু ভাল হবে না।’

মাও খুব খুশী হইয়া একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন, ‘যাক! ভাবছিলাম রাগ করবেন হয়ত। বাঁচা গেল। খুশী হয়েছেন তাহলে—কি বল বাবা, অ্যাঁ? খুশী হয়েছেন, কি বল?’

এই বলিয়া আহ্লাদে একেবারে আটখানা হইয়া চিঠিখানি মা একবার হাতে করিয়া তুলিয়া লইলেন। পড়িতে জানেন না, কি করিবেন, নাড়াচাড়া করিতে করিতে বলিলেন, ‘এই কটি কথা—তাও খামে চিঠি লিখেছেন···যেতে বলেছেন। তা বলবেন বই কি!’

কিয়ৎক্ষণ পরে ননীমাধব জিজ্ঞাসা করিল, ‘কি হবে তাহলে, কবে যাওয়া হচ্ছে আমাদের?’

মা বলিলেন, ‘দাঁড়াও, বাবা দাঁড়াও। যাবে—দুদিন সবুর কর। ভটচাজকে দিন-টিন দেখাই।’

ননীমাধব বলিল, ‘আজই দেখাবেন যেন। মামীমাকে অনেকদিন দেখিনি, আমারও মন কেমন করছে।’

মা বলিলেন, ‘তা ত করবেই বাছা।’

দিন-পনের পরে মামীমার কাছ হইতে একখানি টেলিগ্রাম আসিল। ‘এখনও তোমরা আসিলে না কেন?’

মা আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিলেন না। দিন স্থির হইল, মাসের তেরো তারিখে।

রাত্রে ট্রেন।

একটিমাত্র মেয়ে। বিবাহের সময় মা তাহাকে ফাঁকি দেন নাই। গহনা দিয়াছিলেন প্রায় তিন হাজার টাকার।

জিজ্ঞাসা করিলেন, ‘হ্যাঁ বাবা ননীমাধব, সব গয়নাই দেব সঙ্গে? কি বল তুমি? কিন্তু বাবা, আঁধার রাত, গরুর গাড়িতে যাবে···’

ননীমাধব বলিল, ‘কিছু ভয় নেই মা।’

একটি একটি করিয়া মা তাহাকে সব গহনাই পরাইয়া দিলেন। সব চেয়ে ভাল শাড়ি পরাইলেন, সব চেয়ে ভাল জামা পরাইলেন, দামী একখানি শাল দিলেন সঙ্গে, তাহার পর প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রে

বাক্স গুছাইয়া দিয়া সাবধানে থাকিতে বলিয়া পিঠে হাত দিয়া বলিলেন, 'কাঁদিসনে মা, বড়-জোর সাত দিন কি দশ দিনের বেশি রাখবে না, আমি বলে দিয়েছি ননীমাধবকে।'

মেয়েকে কাঁদিতে নিষেধ করিয়া মাও কাঁদিলেন। 'একা ঘরে তোকে ছেড়ে আমি কেমন করে থাকব মা?'

গরুর গাড়ি আসিয়া দরজায় দাঁড়াইল। শীতকাল। অন্ধকার রাত্রি। গ্রামে তখনও পর্যন্ত দু-একজনের খামারে ধান-ঝাড়াইএর কাজ চলিতেছিল। গাড়ির নীচে গাড়োয়ান একটি লণ্ঠন বাঁধিয়া লইল। মাও কাঁদিলেন। মেয়েও কাঁদিল। মেয়ে-জামাই গাড়িতে উঠিয়া বসিলে গাড়োয়ান গাড়ি ছাড়িয়া দিল। যতক্ষণ দেখিতে পাওয়া গেল লণ্ঠন হাতে লইয়া দরজার কাছে মা দাঁড়াইয়া রহিলেন।

দুধারে ধানের ক্ষেত। মাঝখানে গরুর গাড়ি চলিবার পথ। চারিদিক অন্ধকার। আকাশে অগণিত নক্ষত্র। গাড়ির নিচের লণ্ঠনটির আলোকে পথের একটুখানি মাত্র দেখা যাইতেছিল। দূরে দূরে কয়েকটা অস্পষ্ট গ্রাম। কতকগুলা শৃগাল একবার কাছাকাছি কোথায় যেন চীৎকার করিয়া উঠিতেই ননীমাধব জিজ্ঞাসা করিল, 'হাঁরে পাঁচু, এইখানেই না সেদিন সেই কাকে যেন আগলেছিল?'

গাড়োয়ান বলিল, 'আজ্ঞে না, এখানে নয় জামাইবাবু, সে ওই সেই ভূতেশ্বরের মাঠে। জায়গাটা তেমন ভাল নয়। মড়ুইপুরের একটা শ্মশান আছে।'

গাড়ির মধ্যে একটু একটু করিয়া সরিয়া সরিয়া গৌরী ননীমাধবের গা ঘেঁসিয়া বসিল।

'এই যে এই দিকে ভূতেশ্বরের মাঠ। ঠাকুর আছেন, প্রণাম কর!' বলিয়া ননীমাধব নিজের হাত দুইটি কপালে ঠেকাইয়া গৌরীকেও একটি প্রণাম করিতে বলিল। জিজ্ঞাসা করিল, 'ভয় করছে তোমার?'

গৌরী ঘাড় নাড়িয়া তাহার কানের কাছে মুখ লইয়া গিয়া অত্যন্ত চুপি চুপি বলিল, 'হুঁ।'

ননীমাধবও তেমনি আস্তে আস্তে কহিল, 'গয়নাগুলো পরে আসা ভাল হয়নি। হাত-বাক্সটা কোথায়?'

'এই যে।' বলিয়া গৌরী তাহার পাশে হাত বাড়াইয়া বাক্সটা ননীমাধবের হাতের কাছে আগাইয়া দিল।

ননীমাধব বলিল, 'খোল। একটি একটি করে ধীরে ধীরে গয়না-টয়না সব খুলে তুমি রাখ এতে। রেখে চাবি বন্ধ কর।'

গৌরী তাহাই করিতে বসিল। এবং কিছুক্ষণ পরেই নাকের নাকছবিটি ছাড়া গহনা-গাঁটি সবই খুলিয়া ফেলিয়া বাক্সবন্দী করিয়া চাবিটি ননীমাধবের হাতে দিয়া বলিল, 'তুমি রাখ।'

ননীমাধব বলিল, 'চাবি থাক না তোমার কাছে।'

গৌরী ঘাড় নাড়িয়া চুপিচুপি বলিল, 'না। যদি কেড়ে নেয়।'

বলিয়া ফিক করিয়া একটুখানি হাসিল। অন্ধকারে সে-হাসির কিছু দেখা গেল না। কিন্তু গৌরীর মাথাটা তাহার কোলের উপর ঢলিয়া পড়িতেই ননীমাধব ধীরে-ধীরে তাহা কোল হইতে নামাইয়া দিয়া বলিল, 'ঘুম পাচ্ছে ত শোও এইখানে।'

গাড়ি স্টেশনে আসিয়া পৌঁছিল। সেই স্টেশন। সেদিনও এমনি এক অন্ধকার রাত্রে তাহারা এইখানে আসিয়াই নামিয়াছিল।

লণ্ঠনের কাঁচটা কালি পড়িয়া পড়িয়া একেবারে কাল হইয়া গিয়াছে। গৌরী কতদিনের জন্য বাপের বাড়ি ছাড়িয়া চলিয়াছে কে জানে। পাঁচুর সঙ্গে কথা বলিবার আর কোনও ছুতা না পাইয়া বলিল, 'এ আলোয় তুমি কেমন করে ফিরে যাবে পাঁচু?'

লণ্ঠনটার দিকে একবার তাকাইয়া ঈষৎ হাসিয়া পাঁচু বলিল, 'এতেই ঠিক চলে যাব দিদি, ঘরমুখো গরু—কিচ্ছু বলতে হবে না, দেখতে-না-দেখতে ওরা উড়িয়ে নিয়ে গিয়ে ফেলবে।'

গৌরী চুপি চুপি বলিল, 'মাকে বোল পাঁচু, মা যেন আমার জন্যে না ভাবে।' কথাটা বলিতে বলিতে গৌরীর ঠোঁট দুইটি কাঁপিয়া উঠিল। আরও কি যেন সে বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু বলা হইল না।

গহনার ছোট বাক্সটি হাতে লইয়া ননীমাধব বলিল, 'নে পাঁচু, একে-একে বড় বাক্স দুটো নাবিয়ে নিয়ে চল প্ল্যাটফর্মে, দেখি, গাড়ি আসতে হয়ত আর বেশি দেরি নেই।'

স্টেশন নিতান্ত ছোট। প্ল্যাটফর্ম বলিতে কোথাও কিছু ছিল

না। গাড়ি যেখানে আসিয়া দাঁড়ায়, লাইনের ধারে সেইখানের জমিটা মাত্র লাল কাঁকর বিছাইয়া সমতল করা হইয়াছে। চারিদিক অন্ধকার। স্টেশন-ঘরের সুমুখে দেওয়ালের গায়ে মাত্র কেরোসিনের একটি আলো মিট মিট করিয়া জ্বলিতেছিল। বাকি আলোগুলো তখনও জ্বালান হয় নাই।

বাঙলাদেশে শীত তখন আর নাই বলিলেই হয়। চৈত্রের প্রথম। বসন্তের হাওয়া বহিতেছিল।

বাক্স দুটি নামাইয়া দিয়া প্রণাম করিয়া পাঁচু বিদায় লইল।

ননীমাধব বলিল, 'তুমি ঐ বাক্সের উপর চেপে 'বস।' কিন্তু স্বামী দাঁড়াইয়া আছে, নিজে সে বসিবে কেমন করিয়া! গৌরী ইতস্তত করিতেছিল। ননীমাধব বলিল, 'আমি টিকিট করে আনি।' দুপা আগাইয়া গিয়াই আবার পিছন ফিরিয়া বলিল, 'একা ভয় করবে না ত?'

গৌরী ঘাড় নাড়িয়া বলিল, 'না।'

ট্রেন আসিল আধঘণ্টা দেরি করিয়া। ব্র্যাঞ্চ লাইনের ট্রেন না আছে আলো, না আছে যাত্রী। জন দুই-তিন উঠিল, জন চার-পাঁচ নামিল। একটুখানি গোলমাল হৈ-চৈ হইল। তাহার পর সিটি দিয়া ট্রেন ছাড়িয়া দিল। দেখা গেল, ইণ্টার ক্লাসের একটি কামরায় গৌরী ও ননীমাধব উঠিয়া বসিয়াছে।

ট্রেনের জানালার বাহিরে ননীমাধব ঘন-ঘন তাকাইতেছিল। সুমুখের দুইটা বেঞ্চে আরও জন-কতক যাত্রী আগাগোড়া মুড়িসুড়ি দিয়া ঘুমাইতেছে। গৌরীর ইচ্ছা করিতেছিল, স্বামীর সঙ্গে দুটা কথা কয়। এমনি আর-এক রাত্রে এমনি একটি ট্রেনের কামরাতেই যে তাহাদের প্রথম পরিচয়, হাসিয়া এই কথাটি তাহাকে স্মরণ করাইয়া দিবার জন্য গৌরী উসখুস করিতে লাগিল। কিন্তু সুমুখের বেঞ্চের ঘুমন্ত লোকটা তাহাদেরই দিকে মুখ ফিরাইয়া রহিয়াছে বলিয়া গৌরী না পারিল কথা কহিতে, না পারিল ননীমাধবের কাছ ঘেঁসিয়া আর-একটুখানি সরিয়া বসিতে। গায়ের শালখানি মুড়ি দিয়া সে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

ঘণ্টাখানেক পরে অনেকগুলো ছোট ছোট স্টেশন পার হইয়া আসিয়া অন্ধকার একটি ছোট স্টেশনে ট্রেন আসিয়া দাঁড়াইতেই ননীমাধব বলিল, 'ওঠ।'

গৌরী প্রস্তুত হইয়াই ছিল, চট করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, 'বাক্স দুটো?'

'তুমি নাম আগে।' বলিয়া ননীমাধব দরজা খুলিয়া ধীরে-ধীরে তাহাকে প্রথমে নামাইয়া দিল। তাহার পর বাক্স দুইটা টানিয়া দরজার কাছে আনিয়া নিজেও নামিল, বাক্সও নামাইল।

প্ল্যাটফর্মের বালাই এখানেও নাই।

বাক্স দুইটা নিজের হাতেই কতক টানিয়া, কতক তুলিয়া স্টেশন-ঘরের কাছাকাছি লইয়া গিয়া বলিল, 'বস আমি গাড়ি দেখি। ধর ত এই টিকিট দুটো।' বলিয়া গৌরীকে আবার তেমনি বাক্সের উপর বসাইয়া ননীমাধব, 'গাড়ি!' 'গাড়ি!' করিয়া চীৎকার করিতে করিতে অন্ধকারে বোধ করি স্টেশনের বাহিরেই খোঁজ করিতে গেল।

ট্রেণ আবার ছাড়িয়াছে।

দেখা গেল, গহনার বাক্সটি হাতে লইয়া ননীমাধব একাকী সেই চলন্ত ট্রেনের যে-কক্ষে আসিয়া উঠিয়াছে তাহাতে লোকজন কেহ নাই। মুখে তাহার কেমন যেন একটি অত্যন্ত নীরস নিষ্ঠুর নিরানন্দ হাসি।

স্বল্পালোকিত সেই নির্জন কক্ষে বাতায়ন-পথে মুখ বাড়াইয়া ননীমাধব একবার স্টেশনের দিকে তাকাইল। কেরোসিন-বাতির একটুখানি আলো গৌরীর মুখের উপর আসিয়া পড়িয়াছে। বাক্সের উপর সবুজ রঙের শালখানি গায়ে দিয়া তখনও সে ঠিক তেমনিভাবে নিশ্চল পাষাণ-মূর্তির মত বসিয়া। স্বামীর আগমন-প্রতীক্ষায় অন্ধকারের দিকে ব্যাকুল একাগ্রদৃষ্টি তাহার তখনও নিবদ্ধ।

এই বয়ঃসন্ধিগতা কিশোরীর, এবং শুধু এই কিশোরীর কেন, সমগ্র নারীজাতির নিষ্ঠা ও ভালবাসার উপর আস্থা তাহার অনেকদিন হইতেই নাই। আজও তাই সে তাহার দৈনন্দিন ঘটনার মতই

অত্যন্ত সহজভাবে গৌরীকে পরিত্যাগ করিয়া আসিয়া নিশ্চিন্ত নীরবে গহনার বাক্সটি কোলের উপর চাপিয়া ধরিয়া চুপ করিয়া বসিয়া আছে। কিন্তু এমনি মজা, মুখখানি তাহার চোখের সুমুখ হইতে যতই ঝাপসা হইয়া আসে, ননীমাধবও জানালার বাহিরে তত বেশি করিয়া তাহার গলা বাড়াইয়া দেয়।

কিন্তু সে আর কতক্ষণ!

গাড়ির বেগ ক্রমশ দ্রুত হইতে দ্রুততর হইতে লাগিল। ননীমাধবের চোখের সুমুখ হইতে গৌরীর সেই একাগ্র উন্মুখ দুটি চক্ষু অদৃশ্য হইল, মুখখানি অদৃশ্য হইল, দেহ অদৃশ্য হইল, সবুজ রঙের শাল, শালের নীচে গৌরীর দুটি অলক্তকরঞ্জিত সুকোমল শুভ্র পা, টিনের তোরঙ্গ, কেরোসিনের আলো, দেখিতে দেখিতে পশ্চাতের অন্ধকারের মধ্যে বিলীন হইয়া গেল। হু হু করিয়া বাতাস বহিতে লাগিল। দুপাশের ঘন বন-বেষ্টিত গ্রাম, দিগন্ত-বিলীন শস্যশূন্য উন্মুক্ত প্রান্তর, শুষ্ক ধানের ক্ষেত, সকলের উপরেই অন্ধকারের গাঢ় আস্তরণ ক্রমশ আরও গাঢ়তর হইয়া উঠিল।

গত পনের বৎসরের ইতিহাসে নিষ্ঠুরতার কাহিনী যে তাহার জীবনে একেবারেই নাই তাহা নয়, তবে মানুষের জীবন লইয়া এমন খেলা কোনদিন খেলিয়াছে বলিয়া তাহার মনে হইল না।

গহনার বাক্সটার উপর হাত পড়িতেই ক্ষণপূর্বে যে-মুখ তাহার বিগত জীবনের মতই পশ্চাতের অন্ধকারে মিলাইয়া গিয়াছে, সেই গৌরীর মুখখানাই তাহার আবার মনে পড়িল। মনে পড়িতেই কেমন যেন একটা শুষ্ক অসাড়তায় মাথার ভিতরটা তাহার ঝিম ঝিম করিতে লাগিল।

গাড়ি তখন খুব জোরে চলিয়াছে।

গাড়ির ঝক ঝক শব্দ নির্জন কক্ষের সেই একক যাত্রীটির দুই কানের ভিতর দিয়া, বুকের উপর দিয়া, ধক ধক করিয়া বাজিতে বাজিতে কোথায় যেন অতি নিষ্ঠুরভাবে আঘাত করিতে শুরু করিল। কেন করিল কে জানে। এই অভাবনীয় ব্যাপারে ননীমাধবের বিস্ময়ের আর সীমা রহিল না। গাড়িতে উঠিবার সময় নারীজাতির

উপর তাহার আবাল্যসঞ্চিত বিদ্বেষের, তাহার পুঞ্জীভূত ঘৃণার চমৎকার প্রতিশোধ লইতেছে ভাবিয়া যে-আনন্দ সে অনুভব করিয়াছিল, সহসা না জানি কেন সেই আনন্দের আবেগ কেমন যেন এক প্রাণান্তকারী নির্মম বেদনায় রূপান্তরিত হইয়া তাহার সমস্ত অন্তঃকরণটিকে মুহূর্তের মধ্যে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। শ্বাসরোধ হইবার উপক্রম করিতে লাগিল। মনে হইল, এ তাহার হৃদয়ের দুর্বলতা ছাড়া আর কিছু নয়। তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইয়া চলন্ত গাড়ির মধ্যে টলিতে টলিতে পদচারণা করিতে লাগিল। বাহিরে সূচিভেদ্য ঘন অন্ধকার-পরিবেষ্টিত বিশাল মূঢ় বহিঃপ্রকৃতির মাঝখানে নিঃসহায় নিরবলম্ব নিরপরাধ একটি বালিকার বেদনা-পরিম্লান দুটি সজলপক্ষ্ম চক্ষু, একটি ব্যথিত করুণ মুখচ্ছবি ব্যতীত তাহার মনশ্চক্ষুর সম্মুখে আর কোথাও কিছু অবশিষ্ট রহিল না। গহনার বাক্সটা একবার মাত্র হাতে করিয়া তৎক্ষণাৎ তাহা সে দূরে সরাইয়া দিল।

ট্রেনের গতি তখন আরও বাড়িয়াছে। এইবার বহুদূরে জংশন-স্টেশন। আর-একবার সে জানালার বাহিরে তাকাইল। গাড়ি তখন একটি নদীর পুলের উপর দিয়া সশব্দে চলিয়াছে। পশ্চাতে, ঘন অন্ধকার নদীতীরের বায়ু-হিল্লোলিত শুভ্র কাশগুচ্ছের অস্পষ্ট শুভ্রতা, সম্মুখে, বহুদূরে একটি ডিসট্যান্ট সিগনালের রক্তিম আলোক; ও যেন সেই পরিত্যক্তা গৌরীর দুটি ব্যথিত পাণ্ডুর চোখের মত জ্বল জ্বল করিতেছে! ননীমাধব কোনপ্রকারেই সেদিক হইতে তাহার মুখ ফিরাইতে পারিল না। কিন্তু বাসন্তীর মুখখানা এখনও তাহার মনে আছে। মায়ার কথাও বিস্মৃত হয় নাই। ও-মেয়ে সেই তাদেরই জাত, এই কথা ভাবিয়া সে জোর করিয়া চোখ বুজিল।চোখ বুজিয়াও নিস্তার নাই। মুদ্রিত চক্ষুর সম্মুখবর্তী মসীকৃষ্ণ ঘন অন্ধকারের দুর্ভেদ্য যবনিকা ভেদ করিয়া সে-আলোক যেন তাহার অন্তরের মাঝখানে প্রবেশ করিতে চায়।

এতদিন পরে সত্যই তাহার মনে হইতে লাগিল, নিখিল-ব্যাপী এই বিরাট মিথ্যাচারের বাহিরে সত্য বস্তু হয়ত-বা কোথাও কিছু থাকিতেও পারে।

'অতি ঘরন্তি না পায় ঘর'

বীরভূমের অত্যন্ত ক্ষুদ্র একখানি গ্রামের একেবারে শেষ প্রান্তে, নিতান্ত নগণ্য সাধারণ একটি গৃহস্থালীর সম্মুখে যবনিকা উত্তোলন করিলাম। কিন্তু করিলে কি হইবে, মেঘাচ্ছন্ন আকাশ, সকাল হইতে টিপি-টিপি বৃষ্টি পড়িতেছে, চারিদিকের ঘন কুয়াশা তখনও কাটে নাই, দূর হইতে কিছুই ভাল দেখা যায় না।

অস্পষ্ট একটুখানি যদিই-বা দেখা গেল, তা-ও আবার সেই চির-পুরাতন কাহিনীর পুনরাবৃত্তি। সেই শাশুড়ী আর বৌ!

বধূ—শ্যামা, তন্বী, তরুণী; অতি প্রত্যুষে স্নান করিয়া পিঠে একপিঠ চুল এলাইয়া দিয়া খিড়কির পুকুর হইতে উঠিয়া আসিতেছে, পরনে চওড়া লাল-পাড় শাড়ি, গায়ে একটি সবুজরঙের হাত-কাটা জামা, এক হাতে এক বোঝা বাসন, অন্য হাতে জলের ঘটি।

দরজা পার হইয়া বৌ উঠানে পা দিয়াছে, এমন সময় ঘরের ভিতর হইতে শাশুড়ীর কণ্ঠস্বর শোনা গেল, 'খিড়কির দরজা যে হাঁ হয়ে রইল লবাবের মেয়ে, রোজ-রোজ বলে দিতে হবে না কি?'

বৌ একবার থমকিয়া দাঁড়াইল। এক হাতে বাসন, এক হাতে ঘটি, দুহাত জোড়া। দরজা বন্ধ সে করেই বা কেমন করিয়া! ঘটিটি নামাইতে গিয়া মনে পড়িল, শুচিবায়ুগ্রস্তা শাশুড়ী, জলের ঘটি যেখানে-সেখানে নামাইবার উপায় নাই। তবু সে চেষ্টার ত্রুটি করিল না। পিছন ফিরিয়া পা দিয়া ঠেলিয়া দরজাটা বন্ধ করিতে চাহিল, কিন্তু পোড়া দরজা বন্ধ কিছুতেই হয় না। চুলগুলা হয়ত আবার ভিজিল! রোদ আজ উঠিবে কি না তাই বা কে জানে। ঈষৎ হাসিয়া বলিল, 'পারছি না মা, বাসনগুলো নামিয়ে রেখে আসি।'

'কোন দিন পার?' বলিয়া ঘরের ভিতর হইতে শাশুড়ীঠাকুরানী নিজেই বাহির হইয়া আসিলেন। 'তুমি যদি পারবে বাছা, তবে আমার সুয্যিমণি লঙ্কার গাছগুলি যাবে কেন?'

উঠান পার হইয়া খিড়কির দরজাটি বন্ধ করিয়া দিয়া বলিলেন, 'হাসলে কোন লজ্জায় বাছা? জোয়ান মেয়ের হাসি দেখলে আমার সর্বাঙ্গ জ্বলে যায়।' লজ্জায় বৌএর মাথা যেন আরও হেঁট হইয়া গেল। পোড়ার মুখে হাসি যে কেন আসে···অন্ধকার ঘরের মেঝেয় বাসনগুলা নামাইতে গিয়া শব্দ হইল।

শাশুড়ী বলিলেন, 'তেজ দেখিও না মা, অত তেজ ভাল নয়।'

'কার তেজের কথা বলছ মোক্ষদা?' বলিয়া গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টির জলে ভিজিতে ভিজিতে তাড়াতাড়ি যে-নারীটি ঘরের ছাঁচতলায় আসিয়া দাঁড়াইল, সে ওই পাড়ারই মেয়ে। নাম, নিস্তারিণী। লোকে বলে, টেপির মা। খাটো করিয়া কাপড় পরা। বিধবা বলিয়া মুণ্ডিত-মস্তক। ব্যাপারটা সে আন্দাজি বুঝিয়াছিল। বৌ-মাকে দেখিতে পায় নাই, তবু সে তাহাকেই উদ্দেশ করিয়া সান্ত্বনা দিতে লাগিল, 'ছি মা, শাশুড়ীর ওপর তেজ-অভিমান কি করতে আছে বাছা! শাশুড়ী তোমার মায়ের মতন! ভক্তি-ছেদ্দা কর।'

'হুঁ, করবে!' মোক্ষদা বলিল, 'বস ঠাকুরঝি, বস।'

দাওয়া-উঁচু রকের উপর ঠাকুরঝি বসিল। 'না, আর বসব না ভাই। এইখানি পড়াতে এসেছিলাম।' বলিয়া পেটের তলা হইতে একখানি পোস্টকার্ডের চিঠি বাহির করিয়া বলিল, 'কই গো, বৌ-মা কোথায় গেলে?' বৌ-মা তখন ঘরের ভিতর গামছা দিয়া ভিজা চুলগুলা ঝাড়িয়া লইতেছিল। শাশুড়ী রাগ করিবেন ভাবিয়া তৎক্ষণাৎ বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। তাড়াতাড়িতে মাথার কাপড়টা তাহার দেওয়া হয় নাই।

কিন্তু বলিহারি শাশুড়ীর নজর! দেখিবামাত্র বলিয়া উঠিলেন, 'আবাগী চুলের দেমাকেই মল।'

বৌ তাড়াতাড়ি জিভ কাটিয়া মাথার কাপড়টা টানিয়া দিতেই টেপির মা বলিল, 'না গো না, চুলের দেমাক নয়, হরিশ তোমার ভালবাসে।'

হরিশের মা সে-কথা বিশ্বাস করেন না। চোখ-মুখ উল্টাইয়া

বলিলেন, 'রাখ বাছা, দশ বছর বিয়ে হয়েছে, ছেলে হল না, মেয়ে হল না, অমন ভালবাসার মুখে ছাই।'

'তা সত্যি।' টেঁপির মা বলিল, 'ছেলেমেয়ে নইলে ঘর সাজে না ভাই।'

'কী আর বলব ঠাকুরঝি, আমার অদেষ্ট।' বলিয়া মোক্ষদা হাত দিয়া তাঁহার উঁচু কপালটা দেখাইয়া দিলেন।

'মনসার মাতুলি দিয়েছ?'

'কিছু বাকী নেই বোন।'

টেঁপির মা একটুখানি ভাবিয়া বৌ-এর মুখের পানে একবার তাকাইল। বলিল, 'না, বয়েস এখনও যায়নি। হবে, আমার নারানীর ও-সব কিছু করতে হয়নি মোক্ষদা। তেরো বছরে বিয়ে দিলাম, পনের পেরতে না পেরতেই খুকি হল। এই ত সবে চারটে হয়েছে, এরই মধ্যে বলে কি না, না মা, যাদের হয়নি তারা বেশ আছে। হেসে বলি, ছাখগে আমাদের মোক্ষদার। হবার জন্যে মাথা ঠুকছে।' এদিকে টেঁপির মা, ওদিকে শাশুড়ী, মাঝখানে চিঠিখানি হাতে লইয়া নতমস্তকে বৌ দাঁড়াইয়া। চিঠিখানি সে ইহারই মধ্যে একবার আগাগোড়া পড়িয়া ফেলিয়াছে; আর-একবার পড়িতে গিয়া দেখিল, তারিখটি অনেক দিনের, মাস দুই-তিন আগেকার লেখা চিঠি। ইহাদের কথার ফাঁকে সেই কথা জানাইয়া সে এখান হইতে পলায়ন করিবে ভাবিতেছে, এমন সময় ভারি একটা মজা হইয়া গেল। উঠানের একপাশে বেড়া-দেওয়া ঝিঞে, শশা-গাছগুলির পানে তাকাইয়া টেঁপির মা বলিয়া উঠিল, 'হাতে কি তোর সোনা ফলে মুকু! আহা, ঝিঞে ধরেছে ছাখ! ওমা, এ যে কচি কচি শশাও ধরেছে লা!'

মোক্ষদা বলিলেন, 'এতদিন এই এত বড়-বড় হত ঠাকুরঝি, তা ওই আঁটকুড়ি ছাগলের দায়ে কি কিছু হবার জো আছে।'

'ছাগল!' বলিয়া টেঁপির মা যেন অকস্মাৎ সাপ দেখিয়া লাফাইয়া উঠিল, 'আ-মর! আবাগীরা সব ছোটলোকের মত ছাগল পুষেছে ঘরে-ঘরে! বঁটি দিয়ে ক্যাঁচ করে কেটে ফেলতে পার না পা-দুটো?

তুমি না হয় বিধবা মানুষ, বৌ পারে না?' বলিতে বলিতে উঠানের দিকে সে তাহার লোলুপ দৃষ্টি প্রসারিত করিয়া জলে ভিজিতে ভিজিতে উঠানে গিয়া নামিল।

মোক্ষদা বলিলেন, 'আ! বৌ তাড়াবে ছাগল! তবেই হয়েছে! আমি ত আর লুকিয়ে-ছাপিয়ে বলিনি ঠাকুরঝি, সুমুখে দাঁড়িয়েই বলছি। খিড়কির দুয়োরটি না হবে ত দিনের মাথায় পঞ্চাশবার খুলে খুলে দিয়ে আসছে, আর আমি বুড়ি মাগী যাচ্ছি কিনা বন্ধ করতে। বলবার জো নেই মা, বললে হবে রাগ। মুখ হবে যেন, হাঁড়ি।'

টেপির মার মন তখন পড়িয়া আছে অন্যত্র। জবাব না দিলে নয়, তাই বলিল, 'না বাছা, এ ত ভাল নয়। ওমা, এই যে একটি বেশ বড় ঝিঙে রয়েছে বৌ।' বলিয়া পট করিয়া গাছ হইতে ঝিঙেটা ছিঁড়িয়া লইয়া আঁচলে বাঁধিল। তাহার পর বেড়ার দিকে ইতস্তত দৃষ্টি সঞ্চালন করিতে করিতে কি যে সে বলিতে লাগিল, সে-ই জানে। কতক শোনা গেল, কতক-বা গেল না, 'তরকারির বড় কষ্ট হয়েছে বোন। আহা, বছরের নতুন তরকারি···তা ভাগ্যিস তুমি আছ ভাই। গাছপালা বড় যত্নের জিনিস।' এমনি-সব এলোমেলো কথা বলিতে বলিতে পট পট করিয়া হাতের কাছে ছোটবড় যতগুলো পাইল ঝিঙে ও শশা ছিঁড়িয়া লইয়া আঁচল ভর্তি করিয়া টেপির মা আবার সেইখানে ফিরিয়া আসিল। কিন্তু তখন আর তাহার দাঁড়াইবার অবসর নাই। হাত বাড়াইয়া বলিল, 'কই গো বৌ, দাও আমার চিঠিখানি দাও বাছা। টানা-হাতের লেখা, ও কি আর সহজে তোমার পড়া হবে? থাক। বিকেলে আসব আবার।' বলিয়া সে তাহার কাজ সারিয়া, চিঠি লইয়া জলে ভিজিতে ভিজিতেই দ্রুতবেগে সেখান হইতে সরিয়া পড়িল।

বৌ-এর বসিবার জো নাই। রান্নাঘরে উনান তখন ধরিয়া উঠিয়াছে। ডালের জল চড়াইয়া, ভিজা চুল পিঠের উপর মেলিয়া দিয়া বৌ তরকারি কুটিতে বসিয়াছে, উঠানে হঠাৎ শাশুড়ীর গলার আওয়াজ পাইয়া পিছন ফিরিয়া তাকাইয়া দেখে, মাজা বাসনের গাদা তিনি আবার তুলিয়া লইয়া ভিজিতে ভিজিতে পুকুরের দিকে

চলিয়াছেন। 'আমার মরণ হলে বাঁচি, তা মুখপোড়া যমের কি আর আক্কেল-বুদ্ধি আছে কিছু!'

ধীরে ধীরে মাথার কাপড়টা টানিয়া দিয়া ভয়ে-ভয়ে বৌ জিজ্ঞাসা করিল, 'কি হল মা?'

রাগিয়া মোক্ষদা জবাব দিলেন, 'হল আমার মাথা!' বলিয়া দুপা আগাইয়া গিয়া কহিলেন, 'চুল বাগাবে, না বাসন মাজবে বাছা। দু-কাজ একসঙ্গে হয় না কখনও। বলি, একা বৌ আর কত করবে, ভাবলাম বাসনগুলো সরিয়ে রাখি। রাখতে গিয়ে দেখি না, এই এতখানা এঁটো। যাই আবার সব মেজে আনিগে।'

শাশুড়ী সত্যসত্যই খিড়কির দরজা খুলিয়া পুকুরে গিয়া নামিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে বকিতে বকিতে ফিরিয়া আসিয়া কাপড় ছাড়িয়া ভিজা কাপড় মেলিতে গিয়া আবার চেঁচাইয়া উঠিলেন, 'কাপড় মেলার ছিরি ছ্যাখ! তারের খোঁচে কাপড়খানা যেত এখনই ছিঁড়ে! তা যেত ত যেত, তোমার কি! ভাত-কাপড় দেবার মালিক যে, সেই তাকেই যখন তুক-তাক করে বশ করেছ মা, তখন আর তোমার ভাবনা কি!'

চোখ দুইটা বৌ-এর ছলছল করিয়া আসিল। হাতের উল্টা-পিঠে চোখ মুছিয়া ভাবিল, কাঁদিবার জন্যই ভগবান তাহাকে পাঠাইয়াছেন। কাঁদিয়াই জনম গেল। ডাল ছাঁকিবার শব্দে এতক্ষণ শুনিতে পায় নাই। শুনিল, শাশুড়ীর মুখ তখনও চলিতেছে, 'মা গো মা! আমি ত আঁতকে উঠেছিলাম! ভাবলাম বুঝি-বা অন্ধকারে সাপের গায়েই পা দিলাম। ওমা, ঠাণ্ডা মতন তুলে দেখি না ভিজে গামছাটা ফেলে রেখেছে লবাবের মেয়ে।' বলিয়া গামছা লইয়া তিনি বাহিরে আসিলেন। 'কাজ ত ভারি! এই করতেই যখন এত মা, না জানি একটা ছেলেপুলে হলে কি করতে! ভগবান কি এতই অবুঝ! জানে, জানে, জেনেশুনেই দেয়নি। দেবেও না কোন দিন।'

এইবার বৌ-এর চোখের জল আর কিছুতেই মানা মানিল না। সন্তানের কথায় বুকের ভিতরটা তাহার মোচড় খাইয়া উঠিতেই ঝরঝর করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। 'দণ্ডবত মা তোমার চরণে!' মনে-মনে

শুধু ইহাই বলিয়া বৌ তাহার হাত দুইটি জোড় করিয়া কপালে ঠেকাইতে যাইবে, এমন সময় শাশুড়ী আসিয়া পশ্চাতে দাঁড়াইলেন, 'সর বাছা সর! উনন-শালে বসি একটু। জলে ভিজে ভেতরটা আমার গুরগুরিয়ে উঠল।'

চোখের জল সে মুছিতে ভুলিয়াছিল। শাশুড়ী তাহা দেখিয়া বলিলেন, 'হুঁ, পেঙ্গা-কান্না কেঁদে কেঁদে শাশুড়ীর নামে লাগাবে তা আমি জানি। লাগিয়ে আমার সব করবে তুমি! না বাছা, কাল থেকে আমি নিজে রেঁধে খাব।'

সুষমা সেদিন ধরা পড়িল। ধরা পড়িল একেবারে হাতে-হাতে। সেদিনও তেমনি ঝিম-ঝিম করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছে। তা পড়ুক। বাসনে এঁটো রাখিয়া জাতধম্ম খোয়ানর চেয়ে জলে ভেজা তেমন মারাত্মক নয়। সকালে উঠিয়া মোক্ষদা গিয়াছিলেন খিড়কির ঘাটে।

আপন মনেই বকিতে বকিতে বাসনের বোঝা লইয়া ঘাট হইতে তিনি ফিরিয়া আসিতেছিলেন; হঠাৎ তাঁহার নজর পড়িল সদর দরজার দিকে। দেখেন, সুকু স্যাকরা দাঁড়াইয়া আছে, মাথায় ছাতি, হাতে একটি কাঠের বাক্স। জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কিরে সুকু, কাকে খুঁজছিস?' সুকু বলিল, 'বৌ-মাকে।' মোক্ষদা বলিলেন, 'বৌ-মাকে? কেন?' জবাবে সুকু বলিল, 'আছে কাজ।'

জবাবটা বিশেষ সুবিধার নয়। মোক্ষদা আগাইয়া গেলেন, 'কি কাজ রে সুকু?'

'আজ্ঞে, এই···বালা একজোড়া।'

'বালা!' শাশুড়ী ত অবাক! 'বালা কার রে?' সুকু বলিল, 'বৌমা গড়াতে দিয়েছিলেন।' মোক্ষদা একটুখানি চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন, 'কই দেখি কেমন বালা! আয় ঘরে আয়!' সুকু তাঁহার পিছু-পিছু ঘরের দাওয়ায় আসিয়া দাঁড়াইল। মোক্ষদা গেলেন ঘরের ভিতর বাসন রাখিতে।

সুষমা কিছুই বুঝিতে পারে নাই। ঘুম ভাঙিতে সেদিন তাহার দেরি হইয়া গিয়াছে। কোঠা-ঘরের উপরে তখন সে বিছানা

তুলিতেছিল। নামিয়া আসিল, মাথায় এলোচুলের খোঁপা, কপালে সিঁদুরের টিপ, সবুজ রঙের সেই জামাটি গায়ে, হাতে দুগাছি শাঁখার পাশে সোনার চুড়ি। সিঁড়ির শেষ ধাপে আসিতেই দেখে, ছাতাটি বন্ধ করিয়া সুকু স্যাকরা দাঁড়াইয়া আছে। দেখিবামাত্র মাথায় কাপড়টা টানিয়া দিয়া জিভ কাটিয়া সুষমা বলিল, 'ওমা, আমার কপাল! তোমায় বুঝি এখানে আসতে—।' বৌ ভাবিয়াছিল, শাশুড়ী বুঝি এখনও ঘাটেই আছে। কিন্তু মুখের কথাটা তাহার শেষ হইল না, মাঝখানেই তাহাকে একেবারে অপ্রস্তুতের একশেষ করিয়া দিয়া ঘর হইতে শাশুড়ী বাহির হইয়া আসিলেন। বলিলেন, 'এখানে আসতে আমিই বলেছি মা, অপরাধ হয়ে থাকে, ঘাট মাগছি।' মাথা হেঁট করিয়া পায়ের একটা আঙুল দিয়া সুষমা মাটি খুঁড়িতে লাগিল। মোক্ষদা বলিলেন, 'কই দেখি সুকু, কেমন চুড়ি হল দেখি! ক-ভরি সোনায় ক-গাছি হল?' সুকু হাসিল। হাসিয়া সেইখানেই উবু হইয়া বসিয়া কাঠের বাক্সটি খুলিয়া নীলরঙের পাতলা কাগজে মোড়া যে-বস্তুটি তাহাদের চোখের সুমুখে তুলিয়া ধরিল, তাহা নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর। চুড়ি নয়, গিনি সোনার মূল্যবান কোনও অলংকার নয়, নিতান্ত অল্পবয়স্ক কোনও শিশুর হাতের দুগাছি সরু সরু সোনার বালা মাত্র।

বৌমার মুখের পানে তাকাইয়া সুকু বলিল, 'দেখে নাও বৌ-ঠাকরুন, তুমি ঠিক যেমনটি বলেছিলে, সোনামণির হাতে মানাবে চমৎকার!'

সুষমা মুখে কোন কথাটি না বলিয়া হাত বাড়াইয়া বালা দুইটি গ্রহণ করিল এবং তেমনি নিঃশব্দে ঘাড় হেঁট করিয়া বলিল, 'তুমি যাও।' ইঙ্গিতটা সুকু বুঝিল। বুঝিয়াই ধীরে-ধীরে ছাতাটি হাতে লইয়া দুজনকে দুইটি প্রণাম করিয়া সেইখান হইতে চলিয়া গেল।

মোক্ষদা জিজ্ঞাসা করিলেন, 'সোনামণি বুঝি সেই চপলার ছেলেটার নাম?'

সুষমা বলিল, 'হ্যাঁ।' বলিয়াই সে বালা-জোড়াটি রাখিবার জন্য উপরে উঠিতে যাইতেছিল, শাশুড়ী ডাকিলেন, 'শোন!'

সিঁড়ির কাছে গিয়া সুষমা থমকিয়া পিছন ফিরিয়া দাঁড়াইল।

মোক্ষদা বলিলেন, 'হরিশকে চিঠি লেখা হল তার চাকরির জায়গায়, টাকা পাঠাস, সম্বচ্ছুরের গুড় কিনে রাখব। লিখলে, 'টাকার বড় টানাটানি।' বলি, তা হবেও-বা। নিজে এল; বললাম, ওরে আলুর দর বর্ষাকালে হবে তিন-আনা চার-আনা, তার চেয়ে এই সময় বরং কিছু কিনে রাখ। বললে, 'টাকা নেই।' বলি, ও-সব কি সে নিজে বলেছিল, না তুমি শিখিয়ে দিয়েছিলে?' জবাবের জন্য তিনি তাহার মুখের পানে তাকাইলেন, কিন্তু ও-কথার জবাব দেওয়া বড় শক্ত, বৌ তাই চুপ করিয়াই রহিল। শাশুড়ী মিষ্টি মিষ্টি করিয়া বলিলেন, 'তা ছাড়া কী আর বলি বাছা! যার ভাতারের নেই কানাকড়ি, মাগ তার দাতব্য করে কেমন করে?'

সুষমা আর থাকিতে পারিল না, ফস করিয়া বোধ করি রাগের চোটেই বলিয়া ফেলিল, 'ছেলে তোমার টাকা দেয়নি মা, ও-টাকা আমি নিজে দিয়েছি। ভাংতা কিছু সোনা ছিল আমার, তাই দিয়ে গড়িয়ে দিলাম।'

মোক্ষদা বলিলেন, 'তাই বা দেবে কেন বৌমা, এটা কি আর কথার মত কথা হল? আমারও বোন-পোর ভাতের সময়, তুমিও ত ছিলে তখন মা, কই, দিতে ত পারলাম না কিছু। আমার বোন-পো, তোমার সোয়ামীর সোদর মাসতুতো ভাই, আর এ তোমার কে? গাঁ-সম্পর্কে সই পাতিয়েছ, বেশ করেছ, তাই বলে এত কেন? আমার বাড়ি বসে আমার চোখের সামনে এত বাড়াবাড়ি ভাল লাগে না বাছা! তাই তোমায় এত কথা বললাম, নইলে যা খুশী করগে, মর, দুহাত দিয়ে সব বিলিয়ে দাও, তাতে আমার কী!' কথাটা মন্দ নয়। কিন্তু বৌ হঠাৎ বলিয়া বসিল, 'আমি দেব।'

শাশুড়ী গুরুজন, বাড়ির গৃহিণী, তাঁহার মুখের উপর কথা! রাগ হওয়া স্বাভাবিক। চোখ দুইটি তাঁহার বড় হইয়া উঠিল। বলিলেন, 'দেব! এত বড় কথা!—দিস ত ওই ভালবাসা-ছেলের

মাথা খাস! তার রক্তে চান করিস।' বলিয়াই তিনি হন হন করিয়া সেখান হইতে চলিয়া গেলেন।

সই-এ সই-এ দেখা হয় রোজ, মোড়ল-পুকুরের ঘাটে। সুষমা যায় জল আনিতে, চপলা আসে কাপড় কাচিতে। বৈকালে সেদিন আর সুষমার চুল বাঁধা হইল না, এলোচুল খোঁপার মত করিয়া বাঁধিয়া সে বাহির হইয়া পড়িল। ধানের খেতগুলা পার হইতেই দেখে, ছোট সেই নিমগাছটার তলায় চপলা দাঁড়াইয়া আছে। কাঁখে কলসী, কোলে ছেলে নাই। সুষমা জিজ্ঞাসা করিল, 'সোনা কই লা?'

চপলা বলিল, 'ঠাকুরঝি নিয়ে গেল।'

সুষমা একটুখানি চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, 'সকালেও পাঠাসনি—'

'খেঁদি নিয়ে গেল না ভাই, বললে, বৃষ্টি হচ্ছে, আমি যাব না।'

সুষমা জলে গিয়া নামিল। চপলাও তাহার পিছু পিছু ঘাটে নামিয়া তাহার কাছে গিয়া বলিল, 'বললাম, বলি, হক বৃষ্টি, ছাতিটে মাথায় নিয়ে যা লক্ষ্মী দিদি আমার, সোনামণিকে না দেখলে সই হয় ত ছটফট করবে। কিন্তু এমনি বজ্জাত মেয়ে, গেল না কিছুতেই, ছুটে পালিয়ে গেল সেখান থেকে। তবে আর ননদ বলেছে কাকে! তোর কিন্তু ভাই ও-সব বালাই নেই।' সুষমা চুপ করিয়া রহিল।

চপলা বলিল, 'হ্যাঁ লা, শুনলাম না কি তুই কলকেতা যাবি?'

কথাটা শুনিয়া সুষমা যেন আকাশ হইতে পড়িল। স্বামী তাহার কয়েকবার কলিকাতায় বাসা করিবার কথা বলিয়াছে বটে, কিন্তু সে-কথা আজ পর্যন্ত কাহাকেও সে জানায় নাই। জিজ্ঞাসা করিল, 'তুই কোথায় শুনলি বল!'

চোখ-মুখের সে এক অপরূপ ভঙ্গী করিয়া চপলা বলিল, 'আ, শুনব আবার কোত্থেকে লা? শুনলাম তোর শাশুড়ীর কাছ থেকে।'

'শাশুড়ীর কাছ থেকে?'

চপলা বলিল, 'হ্যাঁ ভাই, আসছিলাম, পথে দেখি, তোর শাশুড়ী-মাগী দাঁড়িয়ে টেপিদের দরজায়, কথা বলছে টেপির মার সঙ্গে। তোর নাম শুনেই দাঁড়ালাম। কিন্তু দাঁড়িয়ে কি আর শোনবার জো আছে ছাই, মাগীদের পেছনে চারটে চোখ। দেখতে পেয়েই চুপ করলে। শুনলাম, তোর বর নাকি চিঠি লিখেছে, তোকে কলকাতায় নিয়ে যাবে। হ্যাঁলা, সত্যি?'

সুষমার মুখখানা অসম্ভব রকম গম্ভীর হইয়া উঠিয়াছিল। খানিকক্ষণ কি যেন ভাবিয়া বলিল, 'জল নেওয়া হল তোর? ওঠ এবার!' অন্য দিন তাহারা কত গল্প করে, সাঁতার কাটে, ঘাট হইতে সহজে ফিরিতে চায় না। চপলা বলিল, 'ওমা! এমন জানলে তোকে বলতাম না যে লা! এই যে আমার হয়ে গেছে, উঠি।' বলিয়া কলসী কাঁখে লইয়া চপলা উঠিল। কিন্তু যে-কথাটা আসল, তাহা এখনও সুষমাকে তাহার বলা হয় নাই। পুকুরের পাড়ে উঠিয়াই চপলা বলিল, 'মরুকগে, ওরা অমন কত বলে, ওর জন্যে দুঃখু কিসের?' সুষমা যেমন চলিতেছিল, তেমনি চলিতে লাগিল।

কথাটা চপলা বলি-বলি করিয়াও বলিতে পারিতেছিল না। ভাবিয়াছিল, সুষমা নিজেই বলিবে, কিন্তু তাহারও আজ বলিবার মত অবস্থা নয়। শেষে একটা ঢোক গিলিয়া একবার তাহার মুখের পানে তাকাইয়া চপলা জিজ্ঞাসা করিল, 'সুকু স্যাকরা আজ গিয়েছিল তোর কাছে?'

সুষমা কি যে বলিবে কিছুই বুঝিতে পারিল না। ঘাড় নাড়িয়া বলিল, 'না।'

চপলা হাসিল। বলিল, 'যাঃ! সুকু যে বললে, গিয়েছিলাম দিদি, দিয়ে এসেছি।'

সুষমা এবার সত্যই বিপদে পড়িল। বলিল, 'হ্যাঁ দিয়েছে, কিন্তু না ভাই, বালা-ফালা দেওয়া-দেওয়ি আমার হবে না।'

কথাটা চপলা বিশ্বাস করিল না। বলিল, 'খারাপ হয়েছে ত? তা হকগে। আবার না হয় ভাল একটা গড়িয়ে দিবি।'

সুষমা বলিল, 'না ভাই, সত্যি বলছি সই, সোনার গয়না দেবার মত অবস্থা আমার নয়। ও দিতে আমি পারব না।'

এবার আর অবিশ্বাস করিবার কিছু নাই। চপলা হতাশ দৃষ্টিতে একবার তাকাইয়া একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিল,—'কেন লা, তোর কিছু হল না কি ?'

সুষমা কথা কহিল না !

চপলা বলিল, 'মানুষকে তাহলে এমন করে আশা দিতে নেই।'

সুষমা নীরব।

অন্য দিনের মত ঘাটে সেদিন তাহাদের দেরি হয় নাই, শাশুড়ী তবু বলিলেন, 'গিয়েছিলে মা সুয্যির আলোয়, ফিরে এলে চাঁদের আলোয়। রোজ রোজ এত কী কথা যে কও মা তোমরা, কে জানে !'

সুষমা সেদিকে কর্ণপাত করিল না। ভিজা কাপড়টা উঠানের দড়িতে টাঙাইতে আসিয়া বলিল, 'কই মা, আমার চিঠি দাও।'

কথাটা যেন শাশুড়ী শুনিতেই পান নাই এমনি ভান করিয়া সেখান হইতে চলিয়া যাইতেছিলেন ; বৌ আবার বলিল, 'আমার চিঠি ?'

'চিঠি !'—শাশুড়ী যেন আকাশ হইতে পড়িলেন ! 'চিঠি কিসের বৌমা ? কার চিঠি ? কেন ? কোথায় ?'

রাগের মাথায় সুষমা বলিতে যাইতেছিল, 'ন্যাকা !' কিন্তু কথাটা সে তৎক্ষণাৎ সামলাইয়া লইয়া বলিল, 'খুলেছেন, পড়েছেন, বেশ করেছেন, দিন আমার চিঠি দিন !'

'ও মা, এ বলে কি গা !' বলিয়া গালে হাত দিয়া মোক্ষদা সেই-খানেই বসিয়া পড়িতেছিলেন, হঠাৎ কি ভাবিয়া বসা আর তাঁহার হইল না, বলিলেন, 'দাঁড়াও, ডাকি টেঁপির মাকে। কপালে আমার শেষ পর্যন্ত এ-ও ছিল ! আজ বলে কি না চিঠি চুরি করেছি, কাল বলবে, গয়না চুরি করেছি, তারপর একদিন হয়ত ধরে ঠেঙাবে। না

মা, কাজ নেই আমার এত সুখে ; আসুক হরিশ, বৌ নিয়ে সে সুখে ঘরকন্না করুক, আমিই বরং কোনও দিকে চলে যাই।'

মোক্ষদা সত্যই বোধকরি টেঁপির মাকে ডাকিবার জন্য চলিয়া গেলেন। সুষমা না ধরাইল উনান, না করিল রান্নার জোগাড়, তুলসীতলায় আলো দিয়া আসন্ন সন্ধ্যার মৃদু জ্যোৎস্নালোকিত গৃহ-প্রাঙ্গণের উপর পায়চারি করিতে লাগিল। আসুক শাশুড়ী, আজ সে একটা হেস্তনেস্ত না করিয়া ছাড়িবে না। কিন্তু হেস্তনেস্ত বিশেষ কিছুই করিতে হইল না, শাশুড়ীর দেরি হইতেছে দেখিয়া সুষমা যেমনি লণ্ঠনটা ধরাইয়া রান্নাঘরের উপর গিয়া উঠিয়াছে, পাড়ার একটা দশ-বারো বছরের ছেলে ছুটিতে ছুটিতে তাহার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল, কাপড়ের তলা হইতে একটা চিঠি বাহির করিয়া বলিল, 'এই নাও।'

সুষমা প্রথমে বুঝিতে পারে নাই, পরে দেখিল, চিঠিখানি তাহারই। জিজ্ঞাসা করিল, 'কে দিলে রে ?' ছেলেটি একটুখানি থতমত খাইয়া বলিল, 'পিওন।'

সুষমা বুঝিতে সবই পারিয়াছিল, তবু সে একবার হাসিয়া ছেলেটিকে কাছে টানিয়া আনিয়া আদর করিয়া মাথায় হাত বুলাইয়া বলিল, 'মিছে কথা বলতে নেই, ছি !—কে দিয়েছে সত্যি করে বল ত ভাই, আমি জানি।'

ছেলেটি প্রথমে পালাইবার চেষ্টা করিতেছিল, কিন্তু না পারিয়া শেষে বলিল, 'বল, তুমি কাউকে বলবে না ! দিব্যি কর আমার গা ছুঁয়ে !' সুষমা তাহাই করিল। ছেলেটি বলিল, 'দিয়েছে টেঁপির মা আর তোমার শাশুড়ী। কিন্তু বল না যেন, আমায় চারটি পয়সা দিয়েছে।' বলিয়াই সে ছুটিয়া সেখান হইতে পলায়ন করিল।

সুষমা দেখিল, চিঠিখানি ময়দা গুলিয়া তাহারই আঠা তৈরি করিয়া বন্ধ করা হইয়াছে, কাঁচা ময়দা তখনও শুকায় নাই। খুলিয়া পড়িল ; দেখিল, স্বামী তাহার এমন-সব কথা লিখিয়াছে যাহা একমাত্র স্ত্রী ছাড়া আর কাহারও কাছে লেখা চলে না ; সুষমার লজ্জা করিতে লাগিল এবং ওই বুড়ী শাশুড়ী-মাগীর উপর ঘৃণায়

অশ্রদ্ধায় তাহার সমস্ত অন্তর ভরিয়া উঠিল। সর্বশেষে স্বামী লিখিয়াছে, 'এবার আর মিছে কথা নয়, বাসা আমি এবার সত্যিই ভাড়া নিয়েছি, আগামী শনিবার রাত্রের ট্রেনে গিয়ে রবিবার রাত্রে তোমায় নিয়ে আসব। তুমি প্রস্তুত হয়ে থেক।'

আজ বৃহস্পতিবার, কাল শুক্রবার, পরশু শনি!

আনন্দে সুষমার বুকের ভিতরটা কেমন যেন করিতে লাগিল। উনানে আগুন দিতে গিয়া আগুন দেওয়া তাহার আর হইল না। একা নিজের জন্য রান্না; ভাবিল, কাজ নাই, আজ চারটি মুড়ি খাইয়া রাত্রি কাটাইলেই চলিবে। আগুনের কাছে বসিয়া বসিয়া অতক্ষণ ধরিয়া রান্না করার চেয়ে একাকী বিছানার উপর শুইয়া বালিশটাকে কোলের কাছে টানিয়া আনিয়া চোখ বুজিয়া তাহার নূতন বাসার কথা ভাবিয়া সে যথেষ্ট আনন্দ লাভ করিবে। চিঠিখানি হাতে লইয়া সে উপরে উঠিয়া গেল; পরিপাটি করিয়া বিছানা পাতিল; বিছানা পাতিয়া তাহারই এক ধারে বসিয়া আবার সে তাহার স্বামীর চিঠিখানি আর-একবার পড়িবার জন্য চোখের সুমুখে মেলিয়া ধরিয়াছে, এমন সময় নীচে হইতে ডাক শোনা গেল, 'কই গো লবাবের মেয়ে, আজ দশমীর দিনে ভর সন্ধ্যেয় শাশুড়ীকে কাঁদান হল, কেন, কিসের জন্যে শুনি! চিঠি চুরি করেছে? ছেলের চিঠি? চুরি করে পড়িয়ে শুনেছে? ছি ছি ছি ছি—বলতে তোমার মুখে একটু বাধল না গা?—কই, কোথায় তুমি?' কণ্ঠস্বর টেপির মায়ের।

টেপি বলিল, 'ওই যে মা, ওপরের ঘরে আলো জ্বলছে, চল না।'

'না মা, আবার এই বেতো পায়ে অতখানা সিঁড়ি···তার চেয়ে তুমিই একবার নেমে এস না বৌমা, একটা কথা আছে, বলি শোন।'

অনিচ্ছাসত্ত্বেও চিঠিখানা বালিশের তলায় রাখিয়া সুষমাকে নামিয়া আসিতে হইল। ভাবিল, এই দুইটা দিনের জন্য তাহারা যাহা বলে বলুক; হীন চৌর্যবৃত্তি তাহাদের যখন ধরাই পড়িয়াছে, তখন আর সে সম্বন্ধে কথা বলিয়া লজ্জা দিয়া লাভ কী! ধীরে-ধীরে সে তাহাদের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। বলিল, 'কি বলছেন?'

টেপির মা বলিল, 'বলি, সোয়ামী না হয় ভালই বাসে, কিন্তু ওই যে শাশুড়ী, এই যে দশমীর দিনে চোখের জল ফেললে, ও তোমার সেই সোয়ামীরই গর্ভধারিণী মা ত, না আর কেউ?'

সুষমা জবাব দিল না। টেপির মা জবাবের অপেক্ষা করে নাই, সে তখনও বলিয়া যাইতেছিল, 'সোনার বালা, পরের ছেলেকে দিতে না হয় মানাই করেছে, তাই বলে উল্টে তাকে চোর বলে জব্দ করা! ছি! ছি! এত বড় হয়েছ বাছা, বুদ্ধি-শুদ্ধি কি তোমার এখনও হল না?...হয় না, তা জানি। ছেলেপুলে না হলে মেয়েদের...যদি একটা হত ত ওই ছেলের চিঠি চুরি করে পড়ার অপবাদ দিতে তুমি পারতে না শাশুড়ীকে। বুঝলে?'

এবার সুষমার অসহ্য হইয়া উঠিল। বলিল, 'চলুন আমি সদর দরজায় খিল বন্ধ করব।'

'যাব। যাচ্ছি। তোমার ঘরে থাকতে আসিনি। ছেলে না হলে—সেই, কথায় বলে না, সে মেয়ের মুখ দেখলে যাত্রা নেই, সে-মেয়ের হাতে ভিখিরীতে ভিক্ষে নেয় না, তোমার হয়েছে তাই। ধন্যি তোমার শাশুড়ী, তাই...যাক আর বলব না, আয় লো টেপি আয়।' বলিয়া টেপির মা চলিয়া গেল।

সুষমা সদর দরজায় খিল বন্ধ করিয়া আসিয়া দেখে, শাশুড়ী ইহারই মধ্যে লণ্ঠনটা তুলিয়া লইয়া গিয়া ঘরের ভিতর বোধকরি তাঁহার নিজের জন্যই থালার উপর মুড়ি ঢালিতেছেন।

বাড়িতে ওই একটিমাত্র লণ্ঠন। সুষমা আর সেখানে অপেক্ষা না করিয়া অন্ধকার সিঁড়ি ধরিয়া উপরে উঠিয়া গেল। দেখিল, জানালার পথে তাহার বিছানার উপর খানিকটা জ্যোৎস্না আসিয়া পড়িয়াছে। বর্ষার জলো হাওয়ার সঙ্গে কদম ফুলের গন্ধ আসিতেছে। কিয়ৎক্ষণ পূর্বে স্বামীর পত্র পাইয়া এই জ্যোৎস্না-আলোকিত নিসুপ্ত গ্রাম, কদমফুলের গন্ধ-আমোদিত এই গৃহ, সবই তাহার ভাল লাগিতেছিল; কিন্তু হঠাৎ কোন দিক দিয়া কি যে হইয়া গেল, এখন আর তাহার ও-সব কিছুই যেন ভাল লাগিল না। টেপির মার সেই একটা কথাই তাহার কানের কাছে ক্রমাগত বাজিতে লাগিল, 'যে-মেয়ের ছেলে হয়

না, তার মুখ দেখলে যাত্রা নেই, ভিখারীও তার হাতে ভিক্ষা নেয় না।' তবে কি সত্যিই তাই! সুষমা আর দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিল না, বিছানার উপর শুইয়া পড়িয়া হাতড়াইয়া বালিশের তলা হইতে চিঠিখানি বাহির করিল এবং তাহাই সে তাহার বুকের কাছে চাপিয়া ধরিয়া উপুড় হইয়া বোধ করি ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল।

পরদিন সকালে সুষমার ঘুম ভাঙ্গিতেই দেখে, পায়ের কাছে এক থালা মুড়ি, বাটিতে ভিজা ছোলা, খানিকটা কাঁচা গুড় আর এক গ্লাস জল নামান। গুড়ে পিঁপড়া ধরিয়াছে। লণ্ঠনটা তখনও জ্বলিতেছিল। শাশুড়ী বোধকরি রাত্রে এ-সব ধরিয়া দিয়া গিয়াছেন। সমস্ত রাত্রি উপবাসের পর সুষমা অত্যন্ত ক্লান্তি বোধ করিতেছিল। আজ একাদশী। শাশুড়ীর রান্না নাই। শয্যাত্যাগ করিয়া, বিছানা তুলিয়া সুষমা নীচে আসিয়া প্রথমেই গোয়াল পরিষ্কার করিতে গেল, দেখিল, গোয়ালে গোবর নাই, শাশুড়ী বোধ হয় নিজেই পরিষ্কার করিয়াছেন; গাই বাছুর ছাড়িয়া দিয়া পুকুরে গিয়াছেন স্নান করিতে। সুষমাও ভাবিল, সকাল-সকাল চারটিখানি রান্না করিয়া সে-ও আজ কলিকাতা যাইবার জন্য জিনিসপত্র গোছ-গাছ করিবে। উনানে আগুন দিয়া সুষমা গিয়াছিল পুকুরের ঘাটে। ফিরিতে তাহার একটুখানি দেরি হইল। দেরি হইবার কারণ, বাগদি-বৌ জালি কাঁধে লইয়া পুকুরের পাড় ধরিয়া দূরের কোন একটা পুকুরে যাইতেছিল মাছ ধরিতে। চারটি চাল খরচ হইবে বলিয়া শাশুড়ী মাছ কোনও দিন কেনেন না। সুষমার হঠাৎ কি মনে হইতেই ডাকিল, 'বাগদি-বৌ!'

বাগদি-বৌ বুঝিতে পারিয়াছিল; বলিল, 'এই ত বেরচ্ছি মা, আচ্ছা দেখি, তোমাদের পুকুরেই দেখি এক-হাত। একাদশীর দিন সধবা মেয়ে তুমি···বললে যখন···চাল কিন্তু তুমি নিজের হাতে দিও মা, তোমার ও শাশুড়ী ঠাকরুন···' বলিয়া কথাটা আর শেষ না করিয়াই বাগদি-বৌ ঈষৎ হাসিয়া পুকুরের জলে গিয়া নামিল। এই মাছের জন্যই দেরি। ছোট ছোট কয়েকটি ল্যাটা, চিংড়ি ও পুঁটি মাছ পাতায় জড়াইয়া, মুখ ধুইয়া, কাপড় কাচিয়া

বৌ ঘরের উঠানে পা দিয়াই দেখে, দাওয়ার উপর মজলিস বসিয়াছে। শাশুড়ী স্নান করিয়া কাপড় ছাড়িয়া বসিয়াছেন, টেপি আসিয়াছে, টেপির মা আসিয়াছে, লক্ষ্মীবুড়ী আসিয়াছে, আর তাহাদের সঙ্গে আর-একটি কে বিধবা মেয়ে আসিয়াছে, সুষমা তাহাকে চিনিল না।

টেপির মাকে দেখিয়াই গত কল্যকার সেই কথাটা মনে পড়িতেই তাহার আপাদমস্তক জ্বলিয়া উঠিল। রান্নাঘরের একপাশে মাছ-কয়টি বাটি-ঢাকা দিয়া রাখিয়া সে কাহারও দিকে দৃকপাত না করিয়া কাপড় ছাড়িবার জন্য উপরে উঠিয়া গেল। নূতন মেয়েটি তাহাকে ঘুরিয়া-ফিরিয়া একবার দেখিয়া লইয়া বলিল, 'না মা, এখনও হতে পারে। আমার মামীকে তোমরা দেখনি, দেখলে বিশ্বেস করতে।'

টেপির মা ঘাড় নাড়িয়া ঠোঁট উল্টাইয়া বলিল, 'না বাছা, ধর্মরাজের মাদুলিতে যার হয় না, তার আর···না কি বল মুকু ?'

মোক্ষদা চোখ টিপিয়া হাত নাড়িয়া ইশারা করিয়া বুঝাইয়া দিলেন যে, বৌ উপরে আছে, এ সময় তাঁহার কথা বলিবার উপায় নাই।

বৌ সবই শুনিল, সবই বুঝিল; কিন্তু বিনা বাক্যব্যয়ে যেমন সে উপরে উঠিয়া গিয়াছিল, আবার তেমনি নীরবে নীচে নামিয়া আসিয়া রান্নাঘরে গিয়া রান্না করিতে বসিল। আর একটা দিন কোনও রকমে কাটাইয়া দিতে পারিলেই ইহাদের হাত হইতে সে নিষ্কৃতি লাভ করিবে। কোনও রকমে আর একটা দিন। রান্না তখনও তাহার শেষ হয় নাই, এদিকের মজলিস তখনও পুরাদমেই চলিতেছে, এমন সময় খেঁদি আসিল সোনামণিকে কোলে লইয়া। তাহারা যে কখন আসিয়াছে সুষমা তাহা বুঝিতে পারে নাই। হঠাৎ তাহার পিঠের ওপর ঘন ঘন চপেটাঘাতে এবং 'পা পা' 'মা মা' শব্দে সচকিত হইয়া পিছন ফিরিতেই দেখে, তাহার পিঠের কাছে ছেলেটাকে দাঁড় করাইয়া দিয়া খেঁদি একটুখানি দূরে দাঁড়াইয়া হাসিতেছে।

কাল হইতে সোনামণিকে সে দেখে নাই। দেখিবার জন্য

মুখ ফিরাইতেই সোনামণি তাহার কচি কচি সাদা ধপধপে কোমল হাত দুইটি দিয়া সুষমার গলাটা সজোরে জড়াইয়া ধরিয়া খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল।

ওদিকে বিধবাদের বাক-বিতণ্ডা হঠাৎ থামিয়া গিয়াছে। কেন যে থামিয়াছে, সে কথা বুঝিতে সুষমার দেরি হইল না। ছেলেটা পিঠের উপর ঝুলিতেছিল, ভাল করিয়া দেখাও যায় না, ঘাড় ফিরাইয়া আড়চোখে সেদিক পানে একবার তাকাইতেই দেখিল, কমবয়সী সেই অপরিচিতা বিধবা মেয়েটি তাহারই দিকে একদৃষ্টে তাকাইয়া আছে। এখনই হয় ত এই সোনামণিকে লইয়া তাহার সম্বন্ধে কত কথাই না তাহারা আলোচনা করিবে!

কলিকাতা চলিয়া গেলে আবার কতদিন সে তাহার সোনামণিকে দেখিতে পাইবে না। ইচ্ছা করিতেছিল, রান্না ফেলিয়া ছেলেটাকে লইয়া সে দূরে সরিয়া গিয়া একটুখানি বসে। সোনার বালা দুইটি তাহার ওই ছোট্ট দুটি হাতে পরাইয়া দিয়া দেখে, কেমন মানায়! কিন্তু শাশুড়ী-মাগী যে-দিব্যি তাহাকে দিয়াছে তাহা স্বকর্ণে শুনিয়া সে-বালা তাহাকে সে আর দিবে কেমন করিয়া! সুষমার রাগ হইতে লাগিল তাহার নিজেরই উপর। এমন অভিশপ্ত অসহায় জীবন বিধাতা যে তাহাকে কেন দিয়াছেন···! চোখ দুইটা তাহার ছল ছল করিতে লাগিল। রাগে দুঃখে অভিমানে মনে হইল, নিজের মাথাটা নিজেই ঠুকিয়া খানিকটা রক্ত বাহির করে।

খেঁদি তখনও সেইখানে দাঁড়াইয়াছিল। বলিল, 'নে লা খেঁদি, ছেলে সরিয়ে নে।' খেঁদি হাসিতে হাসিতে বলিল, 'না, ও আসবে না। ও বালা পরতে এসেছে।' কথাটা সে বেশ জোরে জোরেই বলিয়াছিল।

ও-দিক হইতে তৎক্ষণাৎ প্রতিবাদ আসিল! টেপির মা বলিয়া উঠিল, 'মেয়ের কথা শোন! বালা পরতে এসেছে! বালা কিসের লা, বালা কিসের? লোকের বালা এত সস্তা নয়।'

লক্ষ্মীবুড়ী গালে হাত দিল, 'হ্যাঁলা, বলিস কি লা! সোনার

বালা—?' বুঝা গেল, এ সম্বন্ধে আলোচনা তাহাদের পূর্বেই হইয়াছে।

সুষমা এবার সত্যই রাগিল। রাগে একেবারে দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হইয়া জোর করিয়া সোনামণির হাত দুইটা তাহার গলা হইতে টানিয়া ছাড়াইয়া দিল এবং তাহাকে দূরে সরাইয়া দিয়া কি যেন বলিতে গিয়া বলিতে পারিল না, ঠোঁট দুইটা কাঁপিয়া উঠিল, মুখ দিয়া কথা বাহির হইল না। ছেলেটা কাঁদিতে এক রকম জানে না বলিলেই হয়। ব্যাপার দেখিয়া একেবারে হতভম্ব হইয়া গিয়া সে সুষমার মুখের পানে ফ্যাল ফ্যাল করিয়া তাকাইয়া রহিল।

সুষমা একবার ঢোঁক গিলিয়া, আড়ালে চোখ মুছিয়া, উনান হইতে কড়াইটা নামাইয়া, নিজে একটুখানি সামলাইয়া লইল; বলিল, 'ওকে এখান থেকে নিয়ে যা বলছি খেঁদি, নইলে কিছু বাকি রাখব না বলে দিচ্ছি।' সুষমার এত রুক্ষ কণ্ঠস্বর খেঁদি কখনও শোনে নাই। এবার সে সত্যসত্যই যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়া সোনামণিকে কোলে তুলিয়া লইবার জন্য হাত বাড়াইল।

সোনামণি কিছুতেই যাইবে না। খিল খিল করিয়া হাসিয়া সে হামাগুড়ি দিয়া সুষমার কাছে ছুটিয়া আসিতে চায়। সুষমা উঠিয়া দাঁড়াইল।

ছেলেটাকে খেঁদি এবার একরকম জোর করিয়াই টানিয়া হিঁছড়াইয়া কোলে তুলিল।

কিন্তু সুষমা সেখান হইতে নড়িল না। দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া সবই সে দেখিল।

দেখিল, ছেলে কোলে লইয়া খেঁদি চলিয়া যাইতেছে। ছেলের যাইবার ইচ্ছা নাই, 'মা মা' বলিয়া সে যত তাহার কোল হইতে নামিয়া পড়িতে চায়, খেঁদি ততই তাহাকে চাপিয়া চাপিয়া ধরে। অবশেষে দরজার কাছে দেখা গেল, সোনামণি নিরুপায় হইয়া খেঁদির চুলগুলা তাহার দুহাতের মুঠি দিয়া চাপিয়া ধরিয়াছে।

সুষমার মনে পড়িল, ছেলেটা রাগিয়া একদিন তাহার নাকের

উপর কামড়াইয়া দিয়াছিল। সবে তখন তাহার তুইটি মাত্র দাঁত উঠিয়াছে। আজও হয় ত আর একটুখানি পরেই সে খেঁদিকে কামড়াইয়া ধরিবে। ছোট ছোট ধারাল কয়টি দাঁতের যন্ত্রণায় খেঁদি হয় ত তাহাকে মারিয়াই বসিবে, নয় ত ওই পথের ধুলার উপরেই তাহাকে নামাইয়া দিয়া ছুটিয়া পালাইবে।

সত্যই সে তাহাই করে কি না, দেখিবার জন্য সুষমা অন্যমনস্কভাবে উঠান পার হইয়া আবার সেই মজলিসের পাশ দিয়া সিঁড়ি ধরিয়া উপরে উঠিয়া গেল। উপরের জানালা হইতে সোনামণিদের বাড়ি যাইবার পথের খানিকটা দেখা যায়। দেখিল কতক্ষণের জন্যই বা! না দেখিলেই বোধকরি ভাল হইত। দেখিল, সোনামণি তাহাকে কামড়াইয়াও ধরে নাই, খেঁদিও তাহাকে মাটিতে নামাইয়া দেয় নাই, হয় ত সে তাহার কথা ইহারই মধ্যে ভুলিয়া গিয়াছে, দিব্যি শান্ত শিষ্ট শিশু হাসিতে হাসিতে খেঁদির কোলে চড়িয়া বাড়ি চলিয়াছে। সুষমার চোখ তুইটা অনেকক্ষণ হইতেই ছলছল করিতেছিল। এইবার সে আঁচল দিয়া ভাল করিয়া চোখ মুছিয়া উদাস দৃষ্টিতে সুমুখের দিকে তাকাইয়া রহিল। পুকুরে কয়েকটা হাঁস চরিতেছিল। সোনামণি হাঁস দেখিতে ভালবাসে। খেঁদি নিশ্চয়ই তাহাকে ওই হাঁস দেখাইয়া ভুলাইয়াছে। হাজার হক, পরের ছেলে ত।

ভাবিতে গিয়া আবার চোখ তুইটা তাহার সজল হইয়া উঠিল। জানালার বাহিরে পুকুর, হাঁস, পথ, ঘাট, বাড়ি, ঘর, বর্হিজগতের যাহা কিছু সবই যেন তাহার চোখের সুমুখে ঝাপসা হইয়া আসিতে লাগিল।

কিয়ৎক্ষণ পরে একটুখানি প্রকৃতিস্থ হইয়া সুষমা নীচে নামিতেছিল, টেপির মা বলিল, 'তা দিলেই যদি মা, ত অমন করে লুকিয়ে-ছাপিয়ে জানালা গলিয়ে ফেলে দেওয়া কেন, সবাইকে দেখিয়ে দিলেই ত হত!' কথাটা বলা হইল অবশ্য সুষমার মুখের পানে তাকাইয়া; কিন্তু সুষমা সেদিকে তাকায় নাই; কাজেই সে-কথায় সে না দিল কান, না দিল জবাব, যেমন যাইতেছিল তেমনি আপন মনেই সে উঠান পার হইয়া রান্নাঘরের দিকে চলিতে লাগিল।

টেপির মা ডাকিল, 'বলি ও মা-ঠাকরুন!' এবারেও সে বুঝিতে পারিল না।

কম বয়সের সেই বিধবা মেয়েটি তখন দেওয়াল ঘেঁসিয়া পা ছড়াইয়া শুইয়া পড়িয়াছে। একাদশীর নিরম্বু উপবাসে মুখখানি শুকন। সে-ই হঠাৎ বলিয়া উঠিল, 'এ তোমাদের ভারি অন্যায় মা! দিয়েছে না-দিয়েছে আগে···টেপি যেমন করে বলছে তাতে ওর কথা আমার বিশ্বেস হচ্ছে না।' মোক্ষদা ঠাকুরানী চোখ টিপিয়া ঘাড় নাড়িয়া জানাইলেন যে, হ্যাঁ, দিয়াছে নিশ্চয়ই।

তাহার পর উঠানের দিকে একবার তাকাইয়া স্পষ্টই বলিলেন, 'ছেলেটাকে সেইজন্যে ফন্দি-ফিকির করে এখান থেকে তেড়ে তেড়ে নিয়ে গেল ওইদিকে, দেখলে না? খেঁদি গিয়ে জানালার নীচে দাঁড়িয়েছে, আর ও দিয়েছে ওপর থেকে জানালা গলিয়ে টপ করে ফেলে।' লক্ষ্মীবুড়ী উৎকর্ণ হইয়া ব্যাপারটা শুনিতেছিল। বলিল, 'হ্যাঁ মা ঠিক বলেছ। সোনার বালা বলে জিনিস, যেমনি পাওয়া আর অমনি টপ করে পেট-আঁচলে ভরে নিয়ে, দে ছুট!'

টেপি মেয়েটি দেখিতে ওই অমনি প্যাঁকাটির মত সরু, বয়স এই সবে ·এগার কি বার, কিন্তু কথাবার্তায় সে বুড়ী মেয়েকেও হার মানায়। তৎক্ষণাৎ সে তাহাদের মাঝখানে আসিয়া হাত মুখ নাড়িয়া বলিয়া উঠিল, 'না বাবা, মিছে কথা বলব কেন, খেঁদিকে পেট-আঁচলে লুকিয়ে নিতে আমি দেখিনি, তবে বৌকে গয়না ফেলে দিতে আমি দেখেছি। দিব্যি কেমন চুপি-চুপি হাতটি গলিয়ে, চক চক করছিল— হ্যাঁ মা, ঠিক আমাদের দিদির হাতের সেই চুড়ির মতন।'

টেপির মা বলিল, 'আমার মেয়ে মিছে কথা বলবে? কেটে খণ্ড খণ্ড করে ভাসিয়ে দেব না সেইদিন!' বলিয়াই সে রান্নাঘরের দিকে তাকাইয়া বৌকে আবার ডাকিতে আরম্ভ করিল, 'বৌ! বলি ওগো লবাবের মেয়ে!'

সুষমা রান্নাঘরের ভিতরে ছিল। বাহিরে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'ডাকছেন আমাকে?'

'হ্যাঁ মা, তোমাকেই ডাকছি। সোনার গয়না বিলিয়ে

দেওয়া শুনে পেটের নাড়ি কন কন করে উঠল, তাই ডাকছি—শোন!'

সুষমা মাথায় কাপড় টানিয়া হেঁটমুখে তাহাদের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। ধীরে ধীরে বলিল, 'কি বলছেন?'

টেপির মা বলিল, 'ছেলে না হলে অমনি হয় বটে, তা জানি, তবে সোনার বালা না দিয়ে, পায়ে একজোড়া রুপোর মল দিলেই হত, আর তাই যদি দিলে ত অমন জানালা গলিয়ে চোরের মত চুপি-চুপি কেন মা, আমরা সবাই দেখতাম, না হয় দেখিয়ে দিলেই হত।'

সুষমা অবাক।

যাই হক, শনিবার রাত্রে হরিশ আসিল। দিব্যি নাদুশ-নুদুশ চেহারা। স্টেশন হইতে অতখানা পথ হাঁটিয়া আসিয়া তাহার ক্ষুধা পাইয়াছে।

খাইতে বসিয়া মাকে কাছে ডাকিয়া বলিল, 'মা, বাসা করেছি।'

মা বলিলেন, 'বেশ ত!'

কিন্তু স্ত্রীকে সেখানে লইয়া যাইবার কথাটা সোজাসুজি বলিতে তাহার কেমন যেন বাধ-বাধ ঠেকিতেছিল। বলিল, 'হোটেলে খেয়ে খেয়ে শরীরটা আমার যেতে বসেছে মা।'

মোক্ষদা বলিলেন, 'বেশ ত, বৌমাকে নিয়ে যাও।'

মা যে এত সহজে রাজি হইবেন হরিশ তাহা ভাবে নাই। মনে হইল বুঝি-বা তিনি রাগ করিয়া বলিতেছেন। জিজ্ঞাসা করিল, 'রাগ করে বলছ না ত?'

'না বাছা, রাগ কিসের? রাগ-অভিমান আমাদের সাজবে কেন বাবা? এই যে বৌমা আমায় কাল গাঁয়ের লোকের সামনে অপমান করলে, চোর বললে, বললে, আমি নাকি বৌমাকে-লেখা তোর চিঠি খুলে পড়িয়েছি। কই, রাগ ত আমি করতে পারলাম না। মুখ বুঁজে সয়ে গেলাম! ভাবলাম, আসুক হরিশ, এলে তাকেই বলব। তা বেশ হয়েছে বাছা, তুই যেন আর বৌমাকে কিছু বলিসনে।'

হরিশ কটমট করিয়া বৌ-এর সন্ধানে এদিক-ওদিক তাকাইতে লাগিল, কিন্তু ত্রিসীমানার মধ্যে বৌকে কোথাও দেখা গেল না।

মোক্ষদা জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কবে যাবি ঠিক করেছিস? কাল?'

হরিশ ঘাড় নাড়িয়া বলিল, 'হ্যাঁ।'

মোক্ষদা বলিলেন, 'কিন্তু বৌ নিয়ে যাচ্ছ বলে তুমি যেন না-আসা হয়ো না। তোমায় না দেখতে পেলে এই ঘর-দোরে তালাচাবি বন্ধ করে আমিও একদিন তা হলে—'

হরিশ হাসিল। বলিল, 'না না আমি আসব বই-কি মা, আমি আসব। ও-ও যদি কুলিয়ে-গুছিয়ে বাসা চালাতে না পারে ত ওকেও কি বেশি দিন আমি রাখব সেখানে!'

মার সঙ্গে কথাবার্তা সেদিন তাহার ওই পর্যন্তই হইয়া রহিল।

চিঠি সংক্রান্ত ঝগড়া-ঝাঁটির কথা সুষমাকে জিজ্ঞাসা করিতে সে ভুলিল না। কিন্তু সে সম্বন্ধে সুষমা কোনওরূপ উচ্চবাচ্য না করিয়া চুপ করিয়াই রহিল। হরিশ ভাবিল, তাহারই দোষ। পাছে না যাওয়া হয় ভাবিয়া সুষমা বলিল যে, হাঁ, দোষ তাহারই।

পরদিন রবিবার। সুষমা মনে করিয়াছিল, বৈকালে হয় ত পুকুরের ঘাটেও সইএর সঙ্গে একবারটি দেখা হইবে, সোনামণিকে কোলে লইয়া সে আসিবে নিশ্চয়ই।

কিন্তু সে আসিল না। হয় ত সে সত্যই রাগিয়াছে।

সইএর সঙ্গে না হক সোনামণির সঙ্গে আবার কবে যে তাহার দেখা হইবে কে জানে! যাই হক, কলিকাতা যাইবার সারা পথটা সে এই কথা ভাবিতে ভাবিতে গেল যে, সেখান হইতে নূতন একজোড়া সোনার বালা গড়াইয়া সোনামণিকে পাঠাইয়া দিবে!

রাত্রে ভাল বুঝিতে পারে নাই; সুষমা তাহার পরদিন সকালে দেখিল, বাসাটি নেহাৎ মন্দ নয়। দুইটি লোকের পক্ষে দুখানি ঘরই যথেষ্ট। একখানি ঘরে রান্না হইবে, আর একখানি তাহারা সদা-সর্বদা ব্যবহার করিবে। বড় ঘরখানির জানালা খুলিলেই রাস্তা দেখা যায়, সুমুখে একটি ছোট পার্ক। রাস্তায় গাড়ি-ঘোড়া, লোকজন,

ফিরিওয়ালা! সুষমার মন্দ লাগিল না। সব চেয়ে ভাল লাগিল এই ভাবিয়া যে, সে আজ এতদিন পরে স্বাধীন হইতে পারিয়াছে। স্বামীর কাছে বরং সে না খাইয়াও পড়িয়া থাকিবে, তবুও আর সে কোনও দিন শাশুড়ীর কাছে যাইবে না। থাক সে ওই পাড়া-গাঁয়ে টেঁপির মাকে লইয়া; এখানে সে বেশ ভালই থাকিবে।

কিন্তু ভালই বা সে থাকে কেমন করিয়া!

সকাল সকাল খাওয়া-দাওয়া চুকাইয়া স্বামী চলিয়া যায় আপিসে, না আছে একটা সঙ্গ, না আছে কথা কহিবার লোক, একা একা দিন যেন আর কাটে না। চিরকাল সে পল্লীগ্রামে কাটাইয়াছে, চারিদিক খোলা, চারিদিক সবুজ, চোখের দৃষ্টি কোথাও কখনও ব্যাহত হয় নাই, আর এখানে আসিয়া দেখে শুধু শুকন ইটের বড় বড় বাড়িগুলা আকাশ আড়াল করিয়াছে, মানুষ যে দুদণ্ড চাহিয়া সুখ পাইবে, তাহারও পথ বন্ধ। বৈকালটা তাহার মন্দ কাটে না। কাপড় কাচিয়া, চুল বাঁধিয়া, জানালার কাছে গিয়া চুপ করিয়া বসে। সুমুখের বেড়া-দেওয়া ছোট্ট পার্কের ভিতর পাড়ার যত ছোট ছোট ছেলে-মেয়ে ছুটিয়া ছুটিয়া খেলা করিয়া বেড়ায়। ছুটিয়া খেলা করিবার বয়স যাহাদের এখনও হয় নাই, তাহারা আসে ঝির কোলে চড়িয়া! কচি কচি ঘাসের উপর তাহাদের বসাইয়া দিয়া ঝিরা গল্প করে। তাহাদের মধ্যে একটি ছেলে, দেখিতে ঠিক সোনামণির মত। প্রথম দিন ত দেখিবামাত্র সুষমা একেবারে চমকিয়া উঠিয়াছিল। তাহার পর একদৃষ্টে বহুক্ষণ দেখিয়া দেখিয়া চিনিল—না, সোনামণি তাহার আরও ভাল, সোনামণির হাত-পায়ের গড়ন আরও সুন্দর। আর সোনামণিই বা এখানে আসিবে কেমন করিয়া; ছোট ছোট ছেলে-মেয়েগুলা দেখিতে অনেক সময় ঠিক এক-রকমই হয়।

তাহার পর ধীরে ধীরে সন্ধ্যা নামে। শহরের সন্ধ্যা কিছু বুঝিবার জো নাই। বেলাবেলি আলো জ্বালিয়া দেয়। ছেলে-মেয়েরা পার্ক খালি করিয়া যে-যার বাড়ি ফিরিতে থাকে। সুষমার তখন রান্নার সময়। উনান ধরাইয়া রান্না করিতে বসে। বসিয়া বসিয়া ভাবে, যদি অমনি একটা ছেলে থাকিত। সাজাইয়া-গুছাইয়া, পাউডার

মাখাইয়া, জামা জুতা পরাইয়া, বেড়াইতে পাঠাইতাম, এতক্ষণে সে 'মা মা' বলিয়া ফিরিয়া আসিত, খিল খিল করিয়া হাসিতে হাসিতে কোলে চড়িত, আদর করিতাম, সোহাগ করিতাম, চুমো খাইতাম।

সই একবার বলিয়াছিল, তাদের গ্রামের একটা মেয়ের নাকি ত্রিশ বছর বয়সে এক শিশি ঔষধ খাইয়া ছেলে হইয়াছে, এবং সে ঔষধ না কি কলিকাতায় পাওয়া যায়। ঔষধের নাম সে জানে না। স্বামীকে বলিতে লজ্জাও করে। যাই হক, আজ সে তাহাকে বলিবে নিশ্চয়ই। কলিকাতায় এত বড় বড় ডাক্তার। ঔষধ ইহার একটা-কিছু আছে বই-কি!

দুপুরে ফিরিওয়ালারা কোলের উপর একটা কাঠের বাক্সে নানা রকমের খেলনা সাজাইয়া বাঁশী বাজাইয়া ঘণ্টা বাজাইয়া দোরে-দোরে খেলনা বিক্রি করিয়া বেড়ায়। সুষমা হঠাৎ সেদিন তাহাদেরই একজনকে ডাকিয়া বসিল। ফিরিওয়ালা জানালার কাছে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'কি চাই মা।'

সুষমা কি যে বলিবে ঠিক করিতে পারে না। লজ্জায় তখন তাহার মুখখানা লাল হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু ডাকিয়াছে যখন—বলিল, 'দেখি পুতুল!'

প্রকাণ্ড একটা গাটাপার্চার পুতুল তুলিয়া ফিরিওয়ালা বলিল, 'এ-ই সবচেয়ে ভাল মা, দাম দুটাকা।' বলিয়াই সে পুতুলটাকে জানালা গলাইয়া পার করিতে গিয়া দেখিল, জানালার ফাঁকের চেয়ে পুতুলটি মোটা। বলিল, 'জানালার পথে এ তো পেরবে না মা, খোকাবাবুকে পাঠিয়ে দিন, নিয়ে যাক।'

সুষমা একবার এদিক-ওদিক তাকাইয়া বলিল, 'থাক, তবে ওই ছোট্টই একটি দাও।'

'ছোট? কেন, বড়টিই ত ভাল ছিল মা!'

সুষমা বলিল, 'আর-একদিন দিয়ে যেও; আজ ওই—' বলিয়া সুমুখে আঙুল বাড়াইয়া সুষমা কি যে দেখাইল নিজেও ভাল বুঝিল না। ফিরিওয়ালাও আন্দাজি একটি পুতুল তুলিয়া জানালা গলাইয়া নামাইয়া দিয়া বলিল, 'আট-আনা।' হয় ত কিছু বেশিই

বলিয়াছিল। দাম পাইবামাত্র পুতুলওয়ালা খুশী হইয়াই চলিয়া গেল।

কিন্তু পুতুল লইয়া সে করিবে কি! এতক্ষণে সুষমা তাহার নিজের কাছে নিজেই একটুখানি লজ্জিত হইয়া হেঁটমুখে পুতুলটিকে নাড়াচাড়া করিতে লাগিল। একবার এখানে নামাইল, একবার ওখানে নামাইল, একবার আদর করিল, মুখের কাছে আনিয়া চুমা খাইল, তাহার পর হঠাৎ কোন সময় পুতুলটিকে হাতে লইয়াই সে ঘুমাইয়া পড়িল।

ঘুম ভাঙিল কচি একটি মেয়ের কান্নায়। পার্কের দক্ষিণ দিকে লালরঙের দোতলা ওই রেলিঙওয়ালা বাড়িটার ছোট একটি মেয়ে অনবরত কাঁদে। একবার কাঁদিলে আর সহজে চুপ করিতে চায় না। সুষমার এক-একবার মনে হয়, ছুটিয়া গিয়া উহাকে চুপ করাইয়া আসে। কথাটা শুনিয়া হরিশ সেদিন ত হাসিয়াই খুন! বলে, 'মেয়ে না ছেলে তাই বা তুমি জানলে কেমন করে?'

সুষমা হাসিয়া বলিয়াছিল, 'অত্যন্ত সহজ ব্যাপার। গলার আওয়াজে টের পাওয়া যায়।' বলিয়াছিল, 'ওই যে ওই সাদারঙের বাড়িটা, লাল বাড়িটার পাশেই, ওতে দেখ একটি ছেলে আছে, ফুটফুটে ছোট ছেলে, মুখে তার হাসি যেন লেগেই আছে, জানালার শিক ধরে দাঁড়িয়ে থাকে চব্বিশ ঘণ্টা। বরফওয়ালা হাঁকে, 'বরফ!' ও-ও ডাকে, 'বয়ফ!' বরফওয়ালা বলে, 'নেবে খোকা?' খোকা দোতলার ওপরের ওই জানালার ভেতর দিয়ে হাত বাড়ায়।'

আশ-পাশের যতগুলি বাড়িতে যে-কয়টি ছেলেমেয়ে আছে, সুষমা তাহাদের সব খবরই রাখে। হরিশ হাসিয়া তাহাকে কাছে টানিয়া বলিয়াছিল, 'তোমার ছেলের বড় সাধ হয়েছে, না?

লজ্জায় সুষমা হাসিয়া বলিয়াছিল, 'যাঃও! একটা ওষুধপত্রও ত এনে দিলে না!'

পরদিন সুষমার ঔষধ আসিয়াছে। খাইতে ভাল নয়, অত্যন্ত বিস্বাদ, মুখে দিলে বমি আসে। তা আসুক। প্রাণপণে ঔষধটুকু গিলিয়া ফেলিয়া চোখ বুজিয়া, মুখে চাপা দিয়া সুষমা নিজেকে

সামলাইয়া লয়। ভাবে, যা হয় কিছু একটা হক, ছেলে হক, মেয়ে হক, কানা হক, খোঁড়া হক—হইয়া যদি মরিয়া যায় তাও ভাল, তবু তাহার বাঁজা নাম ঘুচুক।

গত শনিবার দিন হরিশ বাড়ি গিয়াছিল। সোমবার সকালে ফিরিয়া আসিতেই সুষমা জিজ্ঞাসা করিল, 'গিয়েছিলে সোনামণি-দের বাড়ি?'

হরিশ বলিল, 'সময় পেলাম না।'

'সময় পেলে না?' সুষমার ভারি দুঃখ হইল। 'কি এমন কাজে ব্যস্ত ছিলে যে সময় পেলে না?'

হরিশ বলিল, 'আচ্ছা এবার যেদিন যাব সেদিন—'

'না শুধু দেখে আসব নয়', সুষমা বলিল, 'বেতের একটি দোলনা এনে দিও, আর সেই সোনার বালা দুটি···'

হরিশ নিষেধ করিল। বলিল, 'দোলনা দিতে পার; কিন্তু বালা দুটো···মা যখন একবার।' বলিয়াই হরিশ চুপ করিয়া কি যেন ভাবিয়া বলিল, 'নিজের যখন হবে তখন বরং তাকেই দিও।'

সুষমা একদৃষ্টে তাহার মুখের পানে তাকাইয়া মুচকি মুচকি হাসিতে লাগিল। ঘাড় নাড়িয়া বলিল, 'আচ্ছা তাই দেব, কিন্তু দোলনা আমার চাই।'

দোলনা আসিল। কড়িকাঠে দড়ি বাঁধিয়া ঘরের মেঝেয় সেটি টাঙান হইল। দুতিন সপ্তাহ পরে হরিশ একদিন বলিল, 'কাল আমি বাড়ি যাব।' ভাবিয়াছিল, সোনামণির জন্য দোলনাটি হয় ত তাহাকে লইয়া যাইতে হইবে। কিন্তু সুষমা সে-সম্বন্ধে কোনও কথাই বলিল না। বলিল, 'রবিবার রাত্রেই ফিরো যেন।'

হরিশ ভাবিল, দোলনার কথা হয় ত সে ভুলিয়া গিয়াছে। ভালই হইয়াছে। মা ও-সব ভালবাসেন না। পরের ছেলের জন্য দোলনাটা ঘাড়ে করিয়া বহিয়া লইয়া গিয়া বাড়ি ঢুকিলে মা হয় ত বলিতে কিছু বাকি রাখিবেন না।

হরিশ ফিরিল রবিবার রাত্রে। রাত্রি তখন প্রায় দশটা।

দরজা বন্ধ। মনে হইল, ঘরের ভিতর সুষমা যেন গুন গুন করিয়া গান গাহিতেছে। গান সে কোনওদিন গাহে না। গাহিতে জানেও না। কি গান গাহিতেছে শুনিবার জন্য হরিশ জানালার কাছে কান পাতিয়া দাঁড়াইল। শুনিল, গান নয়, সুর করিয়া টানিয়া টানিয়া ছেলে ঘুম-পাড়াইবার ছড়া গাহিতেছে। দরজার কড়া নাড়িতেই গান বন্ধ করিয়া সুষমা উঠিয়া আসিল। জিজ্ঞাসা করিল, 'কে?'

'খোল।' তাড়াতাড়ি দরজা খুলিয়া দিয়া সুষমা বলিল, 'ভাবছিলাম আজ আর এলে না।'

হরিশ এবার সোনামণিকে দেখিয়া আসিয়াছিল! কিন্তু আশ্চর্য, সুষমা তাহার কথা এবার জিজ্ঞাসাই করিল না। বলিল, 'হাত-পা ধোও, খেতে দিই।'

হরিশ দেখিল, ঘরের মেঝের উপর দোলনাটা টাঙান হইয়াছে। দোলনার ভিতর বিছানা পাতা। ছোট ছোট তিনটি বালিশ। আর সেই বালিশে মাথা দিয়া গাটাপার্চারের প্রকাণ্ড একটি পুতুল শুইয়া আছে। পুতুলের মাথায় টুপি, পায়ে মোজা, হাতে সোনার বালা।

হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'এই কি ছেলে না কি তোমার?'

সুষমার লজ্জা হইল। হাসিয়া ঘাড় নাড়িয়া একটা ঢোঁক গিলিয়া বলিল, 'হ্যাঁ।'

তাহার পর সে এক ভারি মজার ব্যাপার!

পরদিন বিড়ালে দুধ খাইয়া গিয়াছে, হরিশের খাওয়া শেষ হইলে জিজ্ঞাসা করিল, 'দুধ দিলে না যে?'

সুষমা বলিল, 'যে দুষ্টু হয়েছে তোমার খোকা, ছুটোছুটি করতে গিয়ে, দিলে হোঁচট খেয়ে ফেলে।'

কথাটা হরিশের মন্দ লাগিল না। হাসিতে হাসিতে সে উঠিয়া দাঁড়াইল।

সুষমা বলিল, 'তার জন্যে কত মার খেলে। মার খেয়ে কেঁদে কেঁদে ঘুমিয়ে পড়ল।' তাহার পর অনেক রাত্রি পর্যন্ত সুষমা তাহার কাল্পনিক সন্তানের কত রকমের কত কথাই না বলিল। বলিল, 'তাহার কথা ফুটিয়াছে। কত পাকা-পাকা কথা! হাঁটিতে শিখিয়াছে। পা পা করিয়া হাঁটে, আর আছাড় খাইয়া খাইয়া পড়ে।'

সে-ছেলের কথা যেন আর শেষই হয় না। হরিশ শেষে ঘুমাইয়া পড়িল। কিন্তু সুষমার চোখে ঘুম নাই। বিছানা হইতে উঠিয়া সে একবার গিয়া দাঁড়াইল দোলনার কাছে। দেখিল, ছেলে তাহার ঘুমাইতেছে। একবার গিয়া দাঁড়াইল জানালার পাশে। পথে তখনও আলো জ্বলিতেছে, রাস্তায় লোক-চলাচল একরকম নাই বলিলেই হয়। আকাশে জ্যোৎস্না। সুমুখের সমস্ত বাড়ি নিস্তব্ধ। কেহ আর বোধ করি জাগিয়া নাই। জাগিয়া থাকিবেই-বা কেন? কোলের কাছে ছেলে শোয়াইয়া নিশ্চিন্ত মনে সকলেই ঘুমাইতেছে। ঘুম নাই শুধু এই হতভাগীর চোখে। নক্ষত্রহীন ধূসর আকাশের পানে তাকাইয়া সুষমা যেন কাহাকে খুঁজিতে লাগিল। কোথায় সেই বিধাতা, যাহার কল্যাণে নারী পুত্রবতী হয়? কোথায় সে? ডাকিলে উদ্দেশ মিলে না, কাঁদিলে সান্ত্বনা নাই, ব্যাকুল প্রার্থনা তাহার সেখানে পৌঁছে কি না, তাই বা কে জানে!···দুই হাত দিয়া জানালার দুই গরাদে ধরিয়া সুষমা ভাবিতে লাগিল।

···সেদিন সে এক ভিখারিণীকে দেখিয়াছে, পরিধানে শতচ্ছিন্ন মলিন বস্ত্র, অনাহারে দুশ্চিন্তায় জরাজীর্ণ দেহ, তবু সে ভাগ্যবতী, পুত্রের জননী!—তিনটি সন্তান, দুইটি কন্যা! কাঁদিয়া বলিয়াছিল, 'আর চাইনে মা, দু-একটা মরে ত ভাল হয়।' সুষমা বলিয়াছিল, 'ছিঃ! মা হয়ে অমন কথা—' মেয়েটা বলিয়াছিল, 'সত্যি কথা বলছি মা, যাক দু-একটা। আমি আর পারি না।' বলিয়া সে ভিখারিণী মেয়েটা তাহার চোখের সুমুখেই ঝরঝর করিয়া কাঁদিয়া ফেলিয়াছিল। সে দৃশ্য সে আজও ভুলে নাই। এমনি হয় ত

কত আছে। কত মেয়ে হয়ত ছেলেমেয়ের জ্বালায় জ্বালাতন হইয়া মুক্তি কামনা করে।

একাকিনী সেই নিস্তব্ধ নিশুতি রাত্রে জানালার পাশে দাঁড়াইয়া নিজের দুর্ভাগ্যের কথা ভাবিতে ভাবিতে সুষমার বুকের ভিতরটা মোচড় খাইয়া উঠিল, চোখে জল আসিল না, কিন্তু তাহার সমস্ত শরীর থরথর করিয়া কাঁপিতে লাগিল। হা অদৃষ্ট! এমনটি যেন তাহার কোনও শত্রুরও না হয়!

খোকার কথা রোজই হয়। হরিশই বরং আজকাল নিজে আসিয়া জিজ্ঞাসা করে, 'কি গো খোকার মার কি হচ্ছে? খোকা কোথায়?'

সুষমা বলে, 'বেড়াতে গেছে।'

হরিশ তাহাকে সাবধান করিয়া দেয়। বলে, 'দেখ, যেন একা যায় না কোনদিন। কলকাতার রাস্তা, চারিদিকে গাড়িঘোড়া, হয় ত বা কোন দিন...'

সুষমার বুকের ভিতরটা ছ্যাঁৎ করিয়া ওঠে। বলে, 'না, সে আমার চালাক ছেলে। তোমার মত বোকা নয়।'

হরিশ বলে, 'আমি বুঝি বোকা?'

সুষমা বলে, 'হ্যাঁ, বোকা নয় ত কী! সেদিন সেই পাঁচ টাকার নোট হারিয়ে এলে, খোকা বলছিল, বাবা ভালি বোকা, বাবাল কান মলে দিতে হবে।'

তাহার পর দুজনেই চুপ। কেহ কোনও কথা খুঁজিয়া পায় না।

খানিক পরে সুষমা বলে, 'খোকা কি বলে জান?'

'কি বলে?'

'বলে, একা একা লান্না কলতে তোমাল কস্তো হয়, নয় মা? আমাল্ বিয়ে দিয়ে দাও, বৌ আচুক, এচে তোমাল লান্না কলে দেবে।'

হরিশ হাসিয়া বলে, 'তাই নাকি?'

সুষমা ঘাড় নাড়িয়া জবাব দেয়। বলে, 'হ্যাঁ, ভারি পাকা পাকা কথা হয়েছে খোকার।'

হরিশ বলে, 'তুমিই ত শিখিয়েছ।'

সুষমা বলে, 'পাগল! আমাকেই সে শেখাতে পারে।'

হরিশ সেদিন আপিস হইতে ফিরিয়া দেখে, সুষমা তাহার বিছানার উপর উপুড় হইয়া শুইয়া আছে, ডাকিলে সাড়া দেয় না।

জিজ্ঞাসা করিল, 'কি গো, আজ আবার তোমার হল কি?'

মুখ না তুলিয়াই সুষমা বলিল, 'খোকা আজ আমায় মেরেছে।'

হরিশ হাসিল, বলিল, 'মেরেছে? সে কি কথা?'

সুষমা বলিল, 'হেসো না। আদর দিয়ে দিয়ে ছেলের মাথাটি তুমি খেলে। শেষে কি না আমার গায়ে হাত তুললে।'

সুষমার গলার আওয়াজ সত্যই ভারি, চোখে জল। পাগলামির আর অন্ত নাই!

হরিশ জিজ্ঞাসা করিল, 'কি দিয়ে মেরেছে? লাঠি দিয়ে?'

সুষমা রাগিয়া উঠিল। 'যাঃও! সবেতেই ইয়ার্কি ভাল লাগে না। লাঠি দিয়ে কেন হবে? কিল, চড়, লাথি, শেষে, বিশ্বাস না হয়, এই ছাখ—!' বলিয়া সুষমা তাহার হাতখানা বাড়াইয়া দিয়া বলিল, 'দিয়েছে কামড়ে। কচি কচি দাঁত···বললাম, ছাড় ছাড়, ছাড় বাবা ছাড়। বললে, 'বল তুমি আমায় বকবে না।' বললাম, 'না।' তখন দিলে ছেড়ে। ছেড়ে দিয়েই সেই যে ছুটে পালিয়ে গেছে, এখনও ফেরেনি।'

হরিশ দেখিল, সুষমা নিজেই তাহার হাতের উপর সজোরে কামড়াইয়া দাঁতের দাগ বসাইয়াছে। সত্যই কি শেষে পাগল হইল না কি?

হরিশ বলিল, 'আচ্ছা ওঠ এখন, খেতে-টেতে দাও, আমি ওকে আজ শাসন করে দেব।'

সুষমা উঠিল। বলিল, 'হ্যাঁ, ওই—মুখেই। শাসন করতে ত দেখলাম না কোনওদিন।' বলিয়া সে বাহির হইয়া গেল।

হরিশ চুপ করিয়া বসিয়া বসিয়া কি যেন ভাবিতে লাগিল।

এমনি করিয়া দিনগুলা সুষমার মন্দ কাটে না।

ছ মাস কাটিল।

সে-বাড়ি ছাড়িয়া দিয়া এখন তাহারা অন্য বাড়িতে উঠিয়া আসিয়াছে। এ বাড়িখানিও রাস্তার ধারেই। কাহারও সঙ্গে কোনও সম্পর্ক নাই। সম্পূর্ণ পৃথক। সংসারের জিনিসপত্রও কিছু-কিছু বাড়িয়াছে। ঘরের মাঝখানে দোলনা টাঙান। টিনের ছোট ছোট দুইটি চেয়ার, একটি টেবিল, কাঠের একটি বেঞ্চ, তাহার উপর কাপড়ের ঢাকনা-দেওয়া সারি সারি তিনটি বাক্স সাজান। বেঞ্চের নীচে পানের সরঞ্জাম, নূতন একটি স্টোভ, স্টোভের উপর দুধের কড়াই। দেওয়ালে কয়েকখানি ছবি। খাট, বিছানা···অভাব কিছুই নাই। তবে সুষমার স্বাস্থ্য যেন একটু-খানি খারাপ হইয়া পড়িয়াছে। চোখের কোণে কালি বসিয়াছে, মুখের সে সৌন্দর্য আর নাই, দিন দিন রোগা হইয়া যাইতেছে, মাথার চুল উঠিয়া গিয়া কপালটা তাহার আজকাল যেন অসম্ভব রকম চওড়া বলিয়া মনে হয়।

হরিশ বলে, 'দিন দিন এ কী তোমার চেহারা হচ্ছে বল ত? কী ভাবছ?' সুষমা সে কথা বিশ্বাস করে না। আর্শীর সুমুখে দাঁড়ায়। বলে, 'কই, কিছুই ত হয়নি।' হরিশ বলে, 'নিজে বুঝতে পারছ না, কিন্তু ছি, তোমার মুখের পানে আর তাকাতে ইচ্ছে করে না।'

'এত খারাপ?'

'হ্যাঁ, এত খারাপ।'

'কি আর করি বল।' বলিয়া হেঁটমুখে তাহার দেহের পানে তাকাইয়া সুষমা একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া চুপ করিয়া থাকে।

হরিশ আজকাল তাহার সঙ্গে ভাল করিয়া কথাই বলে না। মুখের পানে তাকাইয়া তৎক্ষণাৎ মুখ ফিরাইয়া লয়। কথা যদিই-বা কদাচিৎ বলে ত, সে শুধু তিরস্কারের কথা। বলে, 'তোমার শরীরে আর পদার্থ নেই।' বলে, 'ভদ্রলোকের স্ত্রী বলে তোমার আর পরিচয় দেওয়া চলে না।'

সুষমার দুঃখ হয়। বলে, 'একদিন ত চলত।'

হরিশ আর কথা বলে না। সুষমা বারে-বারে আর্শীতে নিজের মুখ দেখে, প্রত্যেকটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের পানে ফিরিয়া ফিরিয়া তাকায়। ভাবে, যৌবন ত মানুষের চিরকাল থাকে না, তাহারই বা থাকিবে কেন?

রাত্রে হরিশ খাইতে বসিয়াছিল। সুষমা হাসিতে হাসিতে বলিল, 'দেখ, ছেলে না হলে মেয়ের অশেষ দোষ।' হরিশ চুপ করিয়া রহিল।

সুষমা বলিল, 'যখন ছোট ছিলাম, চাটুজ্যেদের মতি হত আমার বর, আমি হতাম তার কনে। পুতুলের ছেলেমেয়ে নিয়ে চব্বিশঘণ্টা খেলা কবতাম, পুতুলের বিয়ে দিতাম, বৌ আসত, বৌএর সঙ্গে ঝগড়া করতাম, এই ছিল আমাদের খেলা। মা বলত, দেখ, এত বাড়াবাড়ি বাপু ভাল নয়। 'অতি ঘরন্তী না পায় ঘর, অতি বরন্তী না পায় বর।' তোরও হয় ত তাই হবে, ঘরও পাবি না, বরও পাবি না।'

কথা বলা দূরে থাক, হরিশ একবার মুখ তুলিয়া তাকাইয়াও দেখিল না। খাওয়া শেষ হইলে গম্ভীর মুখে বলিল, 'দুধ দাও।'

সুষমা দুধের বাটি আনিয়া স্বামীর কাছে ধরিয়া ঈষৎ হাসিয়া বলিল, 'চেহারা চেহারা করছ, কিন্তু দেখ, ছেলের মার আবার চেহারার দরকার কি? খোকা বলছিল—'

হরিশ এতক্ষণে কথা বলিল। মনে-মনে বোধ করি সে অনেকক্ষণ হইতেই বিরক্ত হইতেছিল। এইবার মুখ তুলিয়া রাগিয়া চোখ পাকাইয়া বলিয়া উঠিল, দেখ, ছেলে ছেলে আর কর না বলছি। চব্বিশ ঘণ্টা ভাল লাগে না।' আরও কি যেন সে বলিতে যাইতেছিল। কিন্তু বলিবার প্রয়োজন হইল না। সুষমার পক্ষে ইহাই যথেষ্ট। একটি নিষ্ঠুর পদাঘাতে যেন তাহার কল্পনার স্বর্গ এক মুহূর্তে ধূলিসাৎ হইয়া গেল। তৎক্ষণাৎ সে উঠিয়া গিয়া জানালার উপর, বাহিরের দিকে মুখ ফিরাইয়া চুপ করিয়া বসিল। বুকের ভিতরটা

তোলপাড় করিতে লাগিল। চোখ দিয়া দর দর করিয়া জল গড়াইয়া আসিল। মনে হইল, সমস্ত পৃথিবী যেন তাহার দুই চক্ষের সুমুখে চিরদিনের মত অন্ধকার হইয়া গিয়াছে। তাহার সন্তান নাই, তাহার গৃহ নাই, তাহার সংসার নাই, আপনার বলিতে এ বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে তাহার যেন আর কেহ কোথাও বাঁচিয়া নাই, একাকিনী সে শুধু তাহার এই বঞ্চিত অভিশপ্ত জীবনের সর্বপ্রকার বেদনা দুর্ভোগ সহ্য করিয়া তিলে তিলে পুড়িয়া পুড়িয়া বাঁচিয়া থাকিবার জন্যই অফুরন্ত পরমায়ু লইয়া এ পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছে।··· হা ভগবান! সন্তান যদি না দিলে ত মৃত্যু দাও। মৃত্যু দাও!—সুষমা আঁচল দিয়া তাহার দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

হরিশ তাহার এ অহৈতুক কান্নার অর্থ বুঝিল না। এমন কি-কথা সে বলিয়াছে, যাহার জন্য মানুষ এমন করিয়া কাঁদিতে পারে। তাই সে তাহার কান্না থামাইবার চেষ্টাও করিল না, একটি কথাও বলিল না, পানের বাটা হইতে নিজেই একটি পান তুলিয়া লইয়া চুপ করিয়া বিছানার উপর গিয়া শুইয়া পড়িল এবং শুইয়া শুইয়া সে ভাবিতে লাগিল, এখন তাহাকে খাইবার জন্য সাধাসাধি করা উচিত নয়। সাধাসাধি করিলে হয় ত তাহার আর আব্দারের সীমা থাকিবে না। দোষ তাহারই, সুতরাং খাইতে হয় ত সে নিজেই উঠিয়া খাইবে।

পরদিন হইতে সুষমার কি যে হইল—মুখে রা নাই। চুপ করিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়ায়, ডাকিলে সাড়া দেয় না, এক কথা বলিলে দশ কথা শুনাইয়া দেয়, সারাদিন বিরক্ত বিরক্ত ভাব, কিছুই যেন তাহার আর ভাল লাগে না।

হরিশ বলে, 'আপিসের দেরী হয়ে গেল যে!'

সুষমা বলে, 'তা আমি কি করব।'

'আমি কি করব—মানে? রান্নার ভার ত তোমার ওপর।'

'আমি পারব না রান্না করতে।'

'তবে কি আমি করব?'

'না পার, লোক রাখ।'

হরিশ বলিল, 'লোক রাখবার ক্ষমতা যদি আমার না থাকে ?'
সুষমা একটা ঢোঁক গিলিয়া বলিল, 'বিয়ে কর।'
হরিশ আর কিছু না বলিয়া কলতলায় স্নান করিতে গেল।
সুষমা ভাত বাড়িয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

সুষমার মেজাজ হইয়াছে খিটখিটে। একা শুধু স্বামীর সঙ্গেই নয়, ঘরকন্নার প্রত্যেকটি নির্জীব জিনিসপত্রের সঙ্গেও আজকাল সে ঝগড়া করিতে আরম্ভ করিয়াছে। উনানটা ভাল করিয়া ধরে নাই, আঁচ কিছুতেই হয় না, সুষমা বারকতক পাখার বাতাস করিয়া দেখিল; কিন্তু কিছুতেই কিছু হয় না দেখিয়া শেষে 'তোর উনানের মুখে মারি সাত ঝাঁটা' বলিয়া খুন্তি লইয়া আস্ত উনানটাকেই সে ভাঙিতে বসিল। ভাঙিয়া কিয়ৎক্ষণ কাঁদিল। কাঁদিয়া শেষে নিজেই আবার জল দিয়া মাটি মাখিয়া উনান তৈরী করিতে শুরু করিল। গ্লাসটা হয় ত পায়ে ঠেকিয়াছে, সুষমা সেটাকে আর তুলিয়া রাখিল না, পায়ে করিয়া গড়াইতে গড়াইতে গ্লাসটাকে সে মেঝের উপর দিয়া হড় হড় করিয়া ঠেলিয়া ঠেলিয়া ঘরের এক কোণে রাখিয়া আসিল। আর্শীর চারিধারের টিনের বাঁধনটা সেদিন খুলিয়া গিয়াছিল, চুল বাঁধিতে গিয়া ভাঙা আর্শীটাকে কোনও রকমেই সুষমা সেদিন মেঝের উপর দাঁড় করাইতে পারিল না; না পারিয়া এক আছাড় মারিয়া আর্শীটাকেই ভাঙিয়া ফেলিল। দিনের মধ্যে এমন অঘটন যে কত ঘটে তাহার আর ইয়ত্তা নাই।

হরিশও আর সুষমার সঙ্গে ভাল করিয়া কথা বলে না। কথা বলিলে সুষমাও জবাব দেয় না। ইহারই মধ্যে সেই সুষমাকে দেখিলে যেন আর চিনিবার উপায় নাই। হাত পা হইয়াছে সরু, মুখখানি শুকনো, ভাল করিয়া দুবেলা পেট ভরিয়া খায় না, রাত্রে ভাল ঘুমাইতে পারে না, চুল বাঁধে না, ভাল করিয়া শাড়ি পরে না, সাজ-সজ্জা প্রসাধন ত একরকম উঠিয়াই গিয়াছে।

হরিশ নিজেই সেদিন তাহার ছেলের কথা তুলিল। ভাবিল,

অনেক দিন বলে নাই, ছেলের কথায় হয় ত বা মুখে তাহার হাসি ফুটিতে পারে। কিন্তু ফল ফলিল বিপরীত।

সুষমা রাগিয়া উঠিল। বলিল, 'খবরদার! ছেলের কথা তুলো না বলছি! ছেলে কোথায়? ছেলে নেই। ছেলে আমার মরেছে।' মুখ-চোখের ভাবভঙ্গী দেখিয়া হরিশ আর কথা বলিতে সাহস করিল না।

শনিবার রাত্রে হরিশ বাড়ি গিয়াছিল, রবিবার রাত্রে ফিরিয়া আসিয়া দেখিল, সুষমা রান্না করে নাই, চুল বাঁধে নাই, কাপড় কাচে নাই, কিম্ভূতকিমাকার পাগলের মত এলো-চুলে শুকনো মুখে ঘরের মেঝের উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া পড়িয়া ঘুমাইতেছে।

দেখিয়া হরিশের আপাদ-মস্তক জ্বলিয়া উঠিল। বলিল, 'মর্ হতভাগী!'

কিন্তু সে কথা সুষমার কানে গিয়া পৌঁছিল না। কড়া নাড়ার শব্দ পাইয়া সে দরজা খুলিয়া দিয়াই আবার তাহার নিজের জায়গায় আসিয়া শুইয়া পড়িয়াছিল।

হরিশ দেখিল, দোলনার দড়ি কাটিয়া সেটাকে দেওয়ালের গায়ে পেরেক পুঁতিয়া টাঙাইয়া রাখা হইয়াছে। বড় পুতুলটা কোথায় রাখিয়াছে, কে জানে।

জিজ্ঞাসা করিল, 'হ্যাঁগা, রান্না-বান্না করেছ কিছু?'

ঘাড় নাড়িয়া সুষমা বলিল, 'না।'

'খাবে না?'

'না।'

হরিশ উঠিয়া একবার রান্নাঘরটা দেখিতে গেল। দেখিল, উনানের পাশে এলুমিনিয়ামের হাঁড়ির ভিতর আধসেদ্ধ ভাত ডেলা পাকাইয়া পড়িয়া আছে, এদিকে-ওদিকে গোটাকতক আলু ছড়ান, একটা ডিসের উপর খানিকটা বাটা-মসলা শুকাইয়া কাঠ হইয়া রহিয়াছে। দিনের বেলা উনান জ্বালিয়াছিল বলিয়া মনে হয় না। হরিশ তৎক্ষণাৎ বাহির হইয়া গিয়া দোকান হইতে খাবার কিনিয়া আনিল। খাবারের ঠোঙাটা হাতে লইয়াই সে ঘরের মেঝের

একপাশে উবু হইয়া বসিয়া খাইতে শুরু করিয়াছে, দেখিয়া সুষমা ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিল; তাড়াতাড়ি ঠোঙাটা তাহার হাত হইতে কাড়িয়া লইয়া আসন পাতিয়া জল গড়াইয়া ভাল করিয়া খাইতে দিয়া বলিল, 'মরিনি ত এখনও, তবে এমন করে খেতে বসা কেন? আমায় জব্দ করা বই ত নয়!'

হরিশ মনে মনে একটুখানি হাসিল। পাগল আর কাহাকে বলে?

খাবার সে আনিয়াছিল দুজনের মত। সুষমাকে কিছুই বলিতে হইল না। বাহির হইতে আঁচাইয়া হরিশ ফিরিয়া আসিয়া দেখে, সুষমা খাইতে বসিয়াছে। বলিল, 'আজ যদি আমি না আসতাম তাহলে খেতে না ত? না খেয়েই পড়ে থাকতে?'

সুষমা বলিল, 'আমি খেয়েছি।'

'কি খেয়েছ?'

'মুড়ি।'

'কেন, ভাত খেলে না কেন?'

এতক্ষণ পরে সুষমা একটুখানি হাসিল। হাসিয়া বলিল, 'নুন ছিল না। তোমায় বলতে আমার মনে ছিল না।'

হরিশ বলিল, 'ছি! এত ভুল কি ভাল? চব্বিশ ঘণ্টা কি যে ভাবছ আর কি যে করছ বাপু কে জানে। ছেলে হল না বলেই কি—'

কথাটা হরিশকে সে আর শেষ করিতে দিল না। বলিল, 'ফের! কই ছেলের কথা আমি ত মুখেও আনিনি আর!' হরিশ চুপ করিল।

পরদিন অতি প্রত্যুষে শয্যাত্যাগ করিয়া সুষমা উনান ধরাইল।

হরিশ বাজার হইতে ফিরিয়াই ডাকিল, 'কই গো, তুমি একবার এ-ঘরে এস দেখি!'

সুষমা এ-ঘরে আসিয়া দেখে, স্বামী তাহার সঙ্গে একজন ঝি লইয়া আসিয়াছে। দিবারাত্রি কাছে একজন লোক না থাকিলে সত্যই অসুবিধা। বলিল, 'দেখ ত, একে দিয়ে তোমার চলবে কি না!'

সুষমা বলিল, 'আবার ঝি কেন?'

হরিশ বলিল, 'নইলে তোমার কষ্ট হচ্ছে।'

সুষমা একদৃষ্টে তাহার স্বামীর মুখের পানে তাকাইয়া রহিল। স্বামীর এত স্নেহ, এত মমতা…! চোখ দুইটা তাহার জলে ভরিয়া আসিল। তাড়াতাড়ি চোখের জল মুছিয়া সে ঝির কাছে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'তোমার নাম কি মা? কাজ-কর্ম করবে ত? এস আমার সঙ্গে।' বলিয়া তাহার জবাবের অপেক্ষা না করিয়াই সুষমা তাহাকে রান্নাঘরে লইয়া গিয়া বসাইল।

ঝির নাম ক্ষিরো। বয়স বেশি নয়। কাজ-কর্ম করে ভাল। সুষমা বলিল, 'বেশ হয়েছে, তবু কথা কইবার লোক পেয়েছি।'

হরিশ হাসিয়া বলিল, 'সেইজন্যই ত…'

দেখা গেল, সুষমার সে মন-মরা ভাব যেন ধীরে ধীরে কাটিতেছে। কিন্তু কাটিলে কি হইবে, দিন পাঁচ-ছয় পরেই সেদিন মোক্ষদার কাছ হইতে এক টেলিগ্রাম আসিয়া হাজির!

মা মরণাপন্ন। হরিশকে যাইতে লিখিয়াছেন। টেলিগ্রাম হাতে লইয়া হরিশ কাঁপিতে কাঁপিতে বসিয়া পড়িল। 'কি করা যায়! হ্যাঁ গা?'

সুষমা ভাবিয়াছিল, শাশুড়ীর অসুখ, স্বামী হয়ত তাহাকেও সঙ্গে যাইতে অনুরোধ করিবে। কিন্তু শাশুড়ীর কাছে তাহার আর যাইবার ইচ্ছা নাই। বলিল, 'যাও তুমি আগে, তেমন-তেমন যদি দেখ ত আমায় নিয়ে যেও।'

হরিশ বলিল, 'হ্যাঁ সেই ভাল। ঝি রয়েছে, এখন ত নুন অভাবে আর উপোস দিতে হবে না।'

সুষমা ঈষৎ হাসিয়া বলিল, 'না।'

আপিসে ছুটি লইয়া হরিশ সেইদিনই তাহার মরণাপন্ন মাকে দেখিতে গেল। দুদিন পরে বাড়ি হইতে হরিশের চিঠি আসিল, 'মার অবস্থা বিশেষ ভাল নয়, ডাক্তার দেখান হইয়াছে। তোমায় এখানে আনিবার মত অবস্থা এখনও হয় নাই, ভগবান না করুন, যদি হয় ত, তোমায় লইয়া আসিব।'

দুদিন পরে আবার আর একখানা চিঠি! 'মার জ্বর আজ কিছু কমিয়াছে। আর একটু কম পড়িলেই আমি যাইতেছি।'

দশ দিন পরে হরিশ ফিরিয়া আসিল। ফিরিয়া আসিয়া খবর দিল, মা সারিয়া উঠিয়াছেন।

দেখিল, ঘরের মেঝেয় দোলনাটা আবার টাঙান হইয়াছে। সুষমার আবার কেমন যেন মন-মরা ভাব!

সেদিন রাত্রে হরিশ হঠাৎ অত্যন্ত ভাল মানুষের মত সুষমাকে আদর করিয়া কাছে টানিয়া বলিল, 'শরীর তোমার সত্যিই দিন দিন খারাপ হয়ে পড়ছে। কি করি বল ত সুষমা।' এমন আদর সুষমা অনেকদিন পায় নাই। চোখ দুইটা তাহার ছলছল করিতে লাগিল। একটা ঢোঁক গিলিয়া বলিল, 'কি আর করবে?'

হরিশ একটুখানি ভাবিয়া বলিল, 'কোথাও দিনকতক পাঠিয়ে দিতে পারতাম! শরীরটা সেরে আসতে।'

'কোথায় পাঠাবে? পাঠাবার জায়গা কি আর আছে?' বলিয়া সুষমা একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া ঈষৎ হাসিল। সে বড় দুঃখের হাসি। মা নাই, বাপ নাই, ভাই একটা আছে বটে, কিন্তু সেও আবার এমনি যে, একখানা চিঠি পর্যন্ত দেয় না।

হরিশ বলিল, 'তোমার ভাইএর কাছে দিনকতক থেকে এস। আমি তাকে চিঠি লিখি।'

সুষমা হাসিয়া বলিল, 'পাগল! যেচে গিয়ে? ভাইএর বাড়ী? তোমার অপমান হবে। সে আমি জীবন থাকতে পারব না।'

হরিশ আর কিছু বলে নাই। সুষমাও চুপ করিয়া ছিল।

হঠাৎ সেদিন একখানি চিঠি আসিল সুষমার নামে, মেয়েলী হাতের লেখা ঠিকানা, খামের চিঠি। হরিশ বাড়ি ছিল না। চিঠিখানি খুলিয়া সুষমা দেখিল, লিখিয়াছে তার সই। এতদিন পরে সইএর একখানি চিঠি দিবার অবসর মিলিয়াছে। তাও ভাল। হাসিতে হাসিতে পরম আগ্রহে সুষমা চিঠি পড়িতে বসিল। লিখিয়াছে—

ভাই সই, অনেক দুঃখে তোকে আজ চিঠি লিখিতে বসিয়াছি। ঠিকানা জানিতাম না। সোনামণির বাবা সেদিন হরিশ ঠাকুরপোর কাছে ঠিকানা জানিয়া আসিয়াছে। বলি, তোর আক্কেলটা কি বল

দেখি? ছেলে হইবে না বলিয়া ইহারই মধ্যে একেবারে সব আশা ছাড়িয়া দেওয়া তোর উচিত হয় নাই। সেই—কথায় বলে, 'স্বামী হেন জিনিস, যমকে দিতে পারি তবু পরকে দিতে পারি না।' তুই কিনা শেষে তাই দিলি? হরিশ-ঠাকুপোর বিয়ে শুনিয়া আমি ত অবাক। প্রথমে বিশ্বাস করিতে পারি নাই। পরে সত্যিই দেখিলাম, বিয়ে করিয়া বৌ ঘরে আনিলেন। সম্বন্ধ টেপির মা করিয়া দিয়াছে। তাহার বড় মেয়ে নারানীর ননদ। ছি ছি সই, বৌ যা হইয়াছে একেবারে যমের অরুচি। তোর দাসীর যুগ্যি নয়। শুনিলাম, তুই মত দিয়েছিস। যাই হক ভাই, আমার মনে বড় দুঃখু হইয়াছে। তুই আমার পরামর্শ নে। কিছুতেই ছাড়িস না ভাই। সতীনের মুখে ঝাঁটা। বৌ আসিয়া ঘরে ঢুকিবার সময় ছেলে কোলে লইয়া ঘরে ঢুকিবে বলিয়া সোনামণিকে চাহিতে আসিয়াছিল, আমি বোন কিছুতেই পাঠাই নাই। তুই কেমন আছিস লিখিস। চিঠি দিতে ভুলিস না। ইতি। তোর সই।

চিঠি পড়িয়া সুষমার হাত দুইটা থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল। কি যে করিবে কিছুই বুঝিতে পারিল না। স্বামীর উপর রাগে তাহার সমস্ত মন তিক্ত বিরক্ত হইয়া উঠিল। মনে হইল একবার সে আসিলে হয়, তাহাকে জিজ্ঞাসা করিবে, তাহার সহিত এ ছল-চাতুরী সে কেন করিল। তাহার যে আপনার বলিতে কেহ নাই। এখানে যদি তাহার স্থান না হয় ত, সে কোথায় গিয়া দাঁড়াইবে? কোথায় গিয়া আশ্রয় প্রার্থনা করিবে?

এতক্ষণ পরে সুষমার চোখ দিয়া টস টস করিয়া জল পড়িতে লাগিল। সেইখানে বসিয়া বসিয়াই খানিকটা কাঁদিল, তাহার পর সেখান হইতে উঠিয়া একবার রান্নাঘরে গেল, সেখানে মন টিকিল না, আবার সে তাহার শোবার ঘরে খাটের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল, সেখানেও ভাল লাগিল না, ভাবিল, জানালার কাছে গিয়া দাঁড়াই। জানালার শিক ধরিয়া বাহিরের পানে উদাস দৃষ্টিতে কিয়ৎক্ষণ তাকাইয়া রহিল। বুকের ভিতর তখন তাহার কি যে হইতেছিল নিজেই ভাল বুঝিল না। চোখের জলে দৃষ্টি তাহার বারে-বারে

ঝাপসা হইয়া আসে, আর বারে-বারে আঁচল দিয়া মুছিয়া আবার ভাল করিয়া তাকাইবার চেষ্টা করে। চিঠির কথা মন যেন তাহার কোনও প্রকারেই বিশ্বাস করিতে চায় না।

সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে। এখনই ঝি আসিবে। সুষমার কিছু ভাল লাগিতেছিল না, তবু সে ধীরে ধীরে রান্নাঘরে গিয়া উনান ধরাইয়া আসিল।

ঝি আসিয়া ডাকিল, 'মা!' সুষমা চোখ মুছিয়া বলিল, 'এস!'

কিন্তু ওই 'মা' ডাক শুনিয়া বুকের ভিতরটা তাহার গুর গুর করিতে লাগিল। ওরে হতভাগী, 'মা' সে নয়, 'মা' সে নয়! মা হইতে সে পারে নাই বলিয়াই আজ তাহার দুর্গতির আর সীমা নাই! আবার পাছে তাহার সুমুখেই কাঁদিয়া ফেলে বলিয়া সুষমা তাড়াতাড়ি ঘরে গিয়া ঢুকিল। বলিল, 'বাটনার সব জোগাড় করে দিয়েছি মা ক্ষিরো। ধোঁয়াটা একটু কমলে, বেটে রেখ।'

হরিশকে কিছুতেই যেন কথাটা সে আর জিজ্ঞাসা করিতে পারে না। হরিশ চলা-ফেরা করে, সুষমা তাকাইয়া তাকাইয়া দেখে। এই লোকটিই যে এমন করিয়া তাহাকে পথে বসাইয়াছে, সে-কথা সে বিশ্বাস করিতে পারে না। জিজ্ঞাসা করিলে পাছে সে এখনই 'হ্যাঁ' বলিয়া বসে, সেই ভয়ে জিজ্ঞাসা করিতেও ভয় হয়, বুকের ভিতরটা দুর দুর করিতে থাকে।

খাইতে বসিয়া হরিশ হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'কি গো, মুখে যে কথা নেই?' সুষমা জবাব দিল না। খাওয়া শেষ হইলে হরিশ বিছানায় গিয়া শুইল। সুষমার খাওয়া সে রাত্রে একরকম হইল না বলিলেই হয়।

দরজা বন্ধ করিয়া আলো নিভাইয়া সুষমা তাহার স্বামীর কাছে গিয়া ভয়ে ভয়ে তাহার গায়ে হাত দিয়া ডাকিল, 'ওগো, শুনছ?'

হরিশের বোধ করি ঘুম পাইতেছিল। বলিল, 'কি?'

কথাটা সুষমার মুখ দিয়া আর বাহির হইল না, ঠোঁট দুইটা কাঁপিতে লাগিল, চোখ দুইটা তখন জলে ভরিয়া আসিয়াছে।

হরিশ জিজ্ঞাসা করিল, 'কি বলছিলে?' সুষমা বলিল, 'কিছু না।' কিন্তু ভারি গলার আওয়াজে টের পাওয়া গেল, সে কাঁদিতেছে।

হরিশ আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিল না, চোখের ঘুম তাহার তৎক্ষণাৎ ছুটিয়া গেল। পাশ ফিরিয়া সুষমার গায়ে হাত দিয়া বলিল, 'তুমি কাঁদছ সুষমা?' সুষমা হঠাৎ ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

হরিশ জিজ্ঞাসা করিল, 'হঠাৎ এ আবার কি হল তোমার? কাঁদছ কেন?'

কাঁদিতে কাঁদিতে সুষমা বলিল, 'আমি দাদার কাছেই যাব।'

হরিশ বলিল, 'বেশ ত। তার জন্যে কান্না কিসের?'

সুষমা বলিল, 'আমি জানি, তুমি কেন পাঠাতে চাও।'

হরিশও এবার একবার অন্তরে বাহিরে শিহরিয়া উঠিল। বলিল, 'কেন? কেন? কি হল? কিসের জন্যে? কি জান? কি? এ্যাঁ?' চোর সহসা ধরা পড়িলে যেমন-ধারা আবোল-তাবোল বকিতে থাকে, হরিশও তেমনি অবান্তর প্রশ্নের পর প্রশ্ন করিতে লাগিল।

চাপা কান্নায় তখন সুষমার দম বন্ধ হইয়া আসিতেছে। কোনও প্রশ্নেরই সে জবাব দিতে পারিল না। ধীরে ধীরে জামার নীচে হইতে সইএর চিঠিখানা বাহির করিয়া হাতখানি সে হরিশের গায়ের উপর বাড়াইয়া দিল। অন্ধকার ঘর। কাগজ, কি চিঠি, কে লিখিয়াছে, কি বৃত্তান্ত কিছুই বুঝিবার জো নাই; হরিশ তৎক্ষণাৎ খাট হইতে লাফাইয়া পড়িয়া ইলেকট্রিকের সুইচ টিপিয়া আলো জ্বালিল। দেখিল, সুষমার হাতে খামের একখানি চিঠি। চিঠিখানি তাড়াতাড়ি আলোর কাছে খুলিয়া পড়িতেই হরিশের বুঝিতে কিছু বাকি রহিল না। বুঝিতে অবশ্য সে অনেকক্ষণ আগেই পারিয়াছিল।—সর্বনাশ!

কি বলিয়া সে যে ইহার কৈফিয়ৎ দিবে, কি বলিয়া সুষমাকে বুঝাইবে, ভাবিতে ভাবিতে কম্পিত হস্তে চিঠিখানি পুনরায় মুড়িয়া রাখিয়া সুষমার কাছে গিয়া দাঁড়াইল। বিছানায় মুখ ঢাকিয়া উপুড় হইয়া সুষমা বোধকরি তখনও কাঁদিতেছিল। হরিশের মুখ দিয়া

অনেকক্ষণ কথা বাহির হইল না। পরে একটুখানি প্রকৃতিস্থ হইয়া কি বলিবে মনে মনে তাহাই ঠিক করিয়া লইয়া, সুষমার গায়ে হাত দিয়া, আদর করিয়া বলিল, 'কেঁদ না, ছি, কি হয়েছে সুষমা? ও কিছু নয়, ও কিছু নয়! ছেলে ছেলে করে মা আমায় পাগল করে তুলেছিলেন, তাই, ও—এমনি একটা—হঠাৎ—ও আর এমন কি হয়েছে, ওকে আনব না কোনদিন, আর আনলেও দুজনে দুটি বোনের মত···আমি তোমারই, বুঝলে? আমি তোমারই।'

সুষমা এইবার মুখ তুলিয়া নিতান্ত সকরুণ দৃষ্টিতে স্বামীর মুখের পানে একবার তাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'তাহলে সত্যি?' 'হ্যাঁ' 'না' কিছুই না বলিয়া, একটা ঢোঁক গিলিয়া, ফ্যাল ফ্যাল করিয়া হরিশ তাহার মুখের পানে তাকাইয়া রহিল। আর কিছু বলিবার প্রয়োজন হইল না।

'মা গো!' বলিয়া সুষমা সেই যে আবার মুখ গুঁজিয়া পড়িল কিছুতেই আর মুখ তুলিল না। কান্নার দমকে তাহার মেরুদণ্ড হইতে পা অবধি থর থর করিয়া কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতে লাগিল। হরিশ কত বলিল, কত বুঝাইল, সুষমা মুখ তুলিয়া একটি কথাও বলিল না।

সমস্ত রাত্রিটা আধ-ঘুম আধ-জাগ্রত অবস্থায় কাটাইয়া সকালে হরিশের যখন নিদ্রাভঙ্গ হইল, দেখিল, উঠিতে তাহার বেলা হইয়া গিয়াছে; এবং সুষমা যে ইহারই মধ্যে কখন শয্যাত্যাগ করিয়া উনান ধরাইয়া রান্না করিতে বসিয়াছে, কিছুই সে বুঝিতে পারে নাই।

যাক, সুষমা যে আজ উঠিয়া বসিয়া রান্না করিবে, হরিশ তাহা ভাবিতে পারে নাই। দুঃখের প্রথম ধাক্কাটা সামলানই দায়। সেইটা যখন সে সামলাইতে পারিয়াছে, তখন আর চিন্তা নাই। হরিশ বেশ খুশী হইয়া হাত-মুখ ধুইয়া ঘরে আসিয়া বসিবামাত্র সুষমা চা লইয়া আসিল। হরিশের আনন্দের আর সীমা রহিল না। হাত বাড়াইয়া আঁচল ধরিয়া সুষমাকে কাছে টানিয়া আনিয়া বলিল, 'বাঃ! এই ত চাই। ও কোথাকার কে এক, কিচ্ছু ভেব না তুমি, লক্ষ্মী রাণী আমার।'

সুষমা হাসিল না, কাঁদিল না, মুখ তুলিয়া একবার চাহিয়াও দেখিল না, ধীরে ধীরে সেখান হইতে সরিয়া গিয়া আবার সে রান্নাঘরে গিয়া ঢুকিল।

স্নান করিয়া খাইতে বসিয়া হরিশ দেখিল, রান্নার কোথাও এতটুকু ত্রুটি বিচ্যুতি কিছুই হয় নাই। অন্য দিনের চেয়ে বরং ভালই হইয়াছে। মনে মনে হরিশ ভাবিল, এতদিনে সুষমা বোধ হয় তাহার ভুল বুঝিতে পারিয়াছে। এইবার বোধহয় সে জব্দ হইয়াছে।

পরমানন্দে আহার করিয়া আপিস যাইবার সময়, সুষমাকে কাছে ডাকিয়া হরিশ বলিল, 'কেঁদ না যেন লক্ষ্মীটি!'

বলিবামাত্র সুষমার দুই চোখ বাহিয়া অশ্রুর ধারা গড়াইয়া পড়িল। তবু সেই জলভরা চোখে একদৃষ্টে স্বামীর মুখের পানে তাকাইয়া ঘাড় নাড়িয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, 'না, কাঁদব না।'

সন্ধ্যা হইতে তখনও অনেক দেরি। হরিশ তাহার আপিস হইতে সেদিন একটুখানি সকাল সকাল বাহির হইল। সুষমা ও-বেলায় বড় ভাল ব্যবহার করিয়াছে। তাহার মহত্বের পরিচয় দিয়াছে। সেই কথা ভাবিতে ভাবিতেই হরিশ বাড়ি ফিরিতেছিল। বাস হইতে নামিয়া প্রসন্ন মনে একটা বিড়ি ধরাইল!

বাড়ি তাহার মাত্র দুতিন মিনিটের পথ। বিড়িটা তখনও শেষ হয় নাই। দরজার কাছে আসিয়া দেখে, তাহারই বাড়ির সুমুখে পথের উপর বিস্তর লোক জড় হইয়াছে; আর জন-দুই পুলিশ কনস্টেবল সেখান হইতে তাহাদের তাড়াইবার চেষ্টা করিতেছে।

ব্যাপার কি জানিবার জন্য তাড়াতাড়ি আগাইয়া গিয়া হরিশ দেখিল, তাহার সদর দরজা খোলা, এবং যেই সে খোলা দরজা দিয়া ঘরে ঢুকিতে যাইবে, অমনি কোথা হইতে ক্ষিরো-ঝি আসিয়া একেবারে তাহার পায়ের কাছে আছাড় খাইয়া চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল, 'ও গো বাবু গো, সর্বনাশ হয়েছে গো!' খুলিয়া স্পষ্ট করিয়া ঝি কিছুই বলিল না, হরিশেরও তখন দাঁড়াইয়া শুনিবার মত অবস্থা নয়, উন্মাদের মত ছুটিয়া সে তাহার ভিতরের ঘরের দরজার কাছে গিয়া দেখিল, দরজা বাহির হইতে ভেজান,

আর সেই দরজার কাছে দাঁড়াইয়া দুজন ভদ্রলোক—সাহেবী পোষাক-পরা, মাথায় টুপি, বোধকরি পুলিশের ইন্সপেক্টার। তাঁহারা তাহাকে সরাসরি ঘরে ঢুকিতে দিলেন না, হাত ধরিয়া থামাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আপনারই বাড়ি?'

হরিশ থতমত খাইয়া কেমন যেন হতভম্বের মত কহিল, 'হ্যাঁ।'

'আপনার স্ত্রী আত্মহত্যা করেছেন গলায় দড়ি দিয়ে। আমরা এসেছি আপনার ঝির মুখে খবর পেয়ে।'

হরিশ আর কিছু শুনিবার জন্য অপেক্ষা না করিয়া দুই হাত দিয়া সুমুখের ভেজান দরজায় ধাক্কা মারিতেই দরজা খুলিয়া গেল। ওদিকের দরজা বন্ধ। অন্ধকার ঘর। বাহির হইতে আসিয়া কিছুই ভাল দেখা যায় না। কাঁপিতে কাঁপিতে দেওয়ালের গায়ে হাতড়াইয়া আলোর সুইচ টিপিতেই হরিশ তাহার চোখের সুমুখে যাহা দেখিল তাহা যেমনি বিস্ময়কর তেমনি ভয়াবহ। আতঙ্কে তাহার সর্বাঙ্গ তখন ঠক ঠক করিয়া কাঁপিতেছে। মাথার ভিতরটা বোঁ বোঁ করিয়া ঘুরিতেছিল। দেখিল, ঘরের ঠিক মাঝখানে সুষমার মৃতদেহ শূন্যে ঝুলিতেছে। দোলনার দড়ি কাটিয়া সেই দড়ি সে নিজের গলায় পরিয়াছে। তাহার পায়ের নীচে টেবিল, টেবিলের উপর হইতে লোহার চেয়ারটাকে বোধকরি পা দিয়া ঠেলিয়া সরাইয়া ফেলিয়াছে। মুখ ছিল তাহার বিপরীত দিকে। আগাইয়া তাহা দেখিবার মত সাহস তাহার হইতেছিল না। তবু সে অজান্তে কখন এক সময় পা টিপিয়া টিপিয়া মৃতদেহের অত্যন্ত সন্নিকটে গিয়া দাঁড়াইল। কিন্তু সুষমার মৃত্যুকাতর বীভৎস মুখের পানে বেশিক্ষণ সে তাকাইয়া থাকিতে পারিল না। চোখ দুইটা বড় হইয়া যেন ঠিকরাইয়া বাহির হইয়া পড়িতেছে, চোয়ালের পাশ দিয়া খানিকটা রক্ত গড়াইয়া আসিয়া জমাট বাঁধিয়া গিয়াছে, মাথাটা ডান দিকে অনেকখানি হেলিয়া পড়িয়াছে। আজ বোধ করি স্নান করিয়া সে আর চুল বাঁধে নাই। ভিজা একমাথা কালো চুল চারিদিকে ছড়ান, গায়ে চমৎকার একখানি জামা, পরনে তাহার সেই সবচেয়ে প্রিয় জামদানি শাড়িখানি; আধখানা খুলিয়া গিয়া

মেঝেয় লুটাইতেছে। হরিশের আপাদমস্তক শিহরিয়া উঠিল। থর থর করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে সে খাটের কাছে গিয়া উপুড় হইয়া পড়িল। বিছানার চাদরটাকে দুই হাতের মুঠি দিয়া টানিয়া টানিয়া জড় করিতে করিতে অবরুদ্ধকণ্ঠে চীৎকার করিয়া উঠিল, 'উঃ! ওকে খুলে ফেলুন। ওকে নামিয়ে দিন, ওকে নামিয়ে দিন।' বলিতে বলিতে নিতান্ত ছেলেমানুষের মত ডুকরাইয়া কাঁদিয়া উঠিয়া বিছানার উপর ঘন ঘন হরিশ তাহার মুখ রগড়াইতে লাগিল।

ইন্সপেক্টর দুজন অত্যন্ত ভদ্র। একজন তৎক্ষণাৎ তাহার কাছে আসিয়া গায়ে হাত দিয়া তাহাকে সান্ত্বনা দিতে লাগিলেন, আর একজন কনেস্টবলের সাহায্যে মৃতদেহটা নামাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। দড়ি কাটিয়া মৃতদেহ নামান হইল। বাহিরে তখন হাসপাতালের গাড়ি আসিয়া দাঁড়াইয়াছে।

ইন্সপেক্টর বলিলেন, 'ডেডবডি মর্গে পাঠাতে হবে।'

হরিশ অবাক হইয়া মুখ তুলিয়া একবার ইন্সপেক্টরের মুখের পানে তাকাইল। ইন্সপেক্টর ভাবিলেন, বুঝি সে নিষেধ করিতেছে। বলিলেন, 'কাণ্ট হেল্প। পাঠাতেই হবে।'

আজ আর সুষমাকে তাহার ছাড়িতে ইচ্ছা করিতেছিল না। নিতান্ত অসহায়ের মত জিজ্ঞাসা করিল, 'আমি যাব সঙ্গে?'

ইন্সপেক্টর বলিলেন, 'চলুন।'

ক্ষিরো-ঝি দরজার কাছেই বোধকরি দাঁড়াইয়া শুনিতেছিল; কাঁদিতে কাঁদিতে ঘরে ঢুকিয়া বলিল, 'একা ত আমি ঘরে থাকতে পারব না বাবু।' ইন্সপেক্টর বলিলেন, 'তালাচাবি বন্ধ করে চলুন, নইলে বলেন ত, আমি একজন কনেস্টবল রেখে যেতে পারি।'

যাই হক, কনেস্টবল রাখিতে হইল না, তালা এবং চাবি হাতের কাছেই ছিল। দুয়ার বন্ধ করিয়া সকলে বাহির হইয়া পড়িল। কিন্তু রাত্রে সেদিন আর 'ময়না' হইল না। ডাক্তার বলিলেন, 'কাল সকালে।'

সুষমাকে হাসপাতালে রাখিয়া হরিশকে থানায় যাইতে হইল।

থানায় এজাহার লিখিতে হইবে! ক্ষিরো-ঝির এজাহার আগেই লেখা হইয়াছে।

থানা হইতে হরিশ যখন বাহির হইল তখন রাত্রি। কোলাহল-মুখরিত আলোকোজ্জ্বল নগরীর পথের উপর দিয়া কত লোক যে চলিয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। তাহার মাঝখানে হরিশ চলিয়াছে। কোথায় চলিয়াছে, কে জানে। মাথা ঘুরিতেছে, পা টলিতেছে, চোখের সুমুখে সমস্ত পৃথিবীর যাবতীয় বস্তুকে আড়াল করিয়া ক্ষণে ক্ষণে মাত্র সেই সুষমার মুখখানি ভাসিয়া উঠিতেছে। আজ হইতে তাহাকে আর সে দেখিতে পাইবে না, ভুলিয়াও কোন দিন আর সে তাহার চোখের সুমুখে আসিয়া দাঁড়াইবে না, তাহারই উপর রাগ করিয়া সে চলিয়া গিয়াছে, অভিমান করিয়া সে আত্মহত্যা করিয়াছে। তাহাকে শাস্তি দিয়াছে। চমৎকার শাস্তি! চমৎকার প্রতিশোধ!

এমনি সব নানান কথা ভাবিতে ভাবিতে উন্মাদের মত বিভ্রান্ত বিহ্বল ভাবে হরিশ পথ চলিতে লাগিল। ভাবিল, পুনরায় বিবাহ না করিলেই বা তাহার এমন কী ক্ষতি হইত। সুষমার চেহারা দিন দিন খারাপ হইতেছিল, সে ত তাহার দোষ নয়! যৌবন মানুষের চিরদিন থাকে না। সুষমার সন্তান হয় নাই, তাহার জন্যই বা দায়ী কে? হরিশের রাগ হইতে লাগিল তাহার মায়ের উপর, মায়ের বন্ধু নিস্তারিণীর উপর। 'ছেলে ছেলে' করিয়া তাহারাই জোর করিয়া তাহার বিবাহ দিয়াছে। কিন্তু সে-ই বা বিবাহ করিল কেন? এ প্রশ্নের জবাব সে পাইল না। এবং পাইল না বলিয়াই বারবার সে নিজেকে শুধু ওই এক কথা জিজ্ঞাসা করিতে করিতে আগাইয়া চলিল, বিবাহ সে করিল কেন? বিবাহ সে করিল কেন?

ভাবিতে ভাবিতে হরিশ কোন দিক দিয়া কোন পথ ধরিয়া যে চলিল, কোথায় তাহার বাড়ি, কিছুই তাহার মনে রহিল না;

চলিয়াছে ত চলিয়াছে। কত রাত্রি হইয়াছে তাহার ঠিক নাই, কোথায় চলিয়াছে তাহার স্থিরতা নাই।

অবশেষে হঠাৎ একটা লোকের গায়ে ধাক্কা লাগিয়া হরিশের চমক ভাঙিল। বাড়ি ছাড়িয়া সে বহুদূর চলিয়া আসিয়াছে। মনে হইল তাহাকে বাড়ি ফিরিতে হইবে। অনেক ঘুরিয়া ঘুরিয়া, দুতিনবার পথ ভুলিয়া হরিশ এক সময় বাড়ির দরজায় আসিয়া দাঁড়াইল। পকেট হাতড়াইয়া চাবি বাহির করিল। চাবি খুলিয়া বাড়ি ঢুকিল।

অন্ধকার উঠানটা কোনও রকমে পার হইয়া ভিতরের ঘরের চাবি খুলিতে গিয়া হরিশের বুকের ভিতরটা ছ্যাঁৎ করিয়া উঠিল। এই ঘরেই সুষমা মরিয়াছে। এই ঘর হইতেই সন্ধ্যার পূর্বে তাহার মৃতদেহ সকলে মিলিয়া ধরাধরি করিয়া বাহির করিয়া লইয়া গিয়াছে। এখনও সে মৃতদেহের সৎকার হয় নাই। এখনও সে তাহার একপিঠ কালো চুল এলাইয়া জামদানি শাড়ি পরিয়া হাসপাতালের সেই অন্ধকার নির্জন কক্ষের মাঝখানে টেবিলের উপর হাত-পা ছড়াইয়া শুইয়া আছে।

দরজা ঠেলিয়া হরিশ ঘরের ভিতর পা বাড়াইল। সম্মুখে, বাহিরে, চারি দিকে অন্ধকার। রাত্রি বোধকরি অনেক হইয়াছে। কোথাও জনপ্রাণীর সাড়াশব্দ নাই। দেওয়াল হাতড়াইয়া ইলেকট্রিকের সুইচ টিপিবার আগেই ভয়ে ভয়ে হরিশ তাহার পকেট হইতে কম্পিতহস্তে দিয়াশলাই বাহির করিয়া একটি কাঠি জ্বালিল। খস করিয়া একটুখানি শব্দ হইল। এবং সেই নিস্তব্ধ অন্ধকারের মধ্যে মাত্র ওই একটি কাঠি জ্বালার শব্দে আপাদমস্তক শিহরিয়া উঠিয়া সে সুমুখে তাকাইতেই দেখিল, কাঠিটা একবার মাত্র জ্বলিয়াই আবার তৎক্ষণাৎ নিভিয়া গিয়াছে। আবার অন্ধকার! এবার যেন আরও গাঢ়, আরও ভয়ানক! মনে হইল, কাঠিটা কে যেন ফুঁ দিয়া নিভাইয়া দিল। মনে হইল, চোখের সুমুখে সুষমার সেই মৃতদেহ ঘরের মেঝের উপর তখনও ঝুলিতেছে। কয়েক পা আগাইয়া গিয়া সুইচ টিপিবার মত সাহস তাহার হইল না। ঠক ঠক করিয়া কাঁপিতে

কাঁপিতে হরিশ ক্রমাগত দিয়াশালাই-এর বাক্সের উপর কাঠির পর কাঠি ঘষিতে লাগিল। কিন্তু কোনটাই ঠিক মত জ্বলিল না। অবশেষে অতি কষ্টে সে চোখ বুজিয়া দেওয়াল ধরিয়া প্রাণপণে খানিকটা আগাইয়া গিয়া সুইচ টিপিল। আলো জ্বলিতেই একটা নিশ্বাস ফেলিয়া সে যেন হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল। টেবিলটা তখনও সরান হয় নাই, চেয়ারটা তাহার পাশে কাত হইয়া পড়িয়া আছে। আর মাথার উপরে, ঘরের ঠিক মাঝখানে দোলনা-টাঙান নারকেলের দড়ির খানিকটা তখনও ঝুলিতেছে।

এতক্ষণে হরিশের মনে হইল, আজ তাহার খাওয়া হয় নাই। না হক, খাইবার তেমন ইচ্ছাও ছিল না। একটা গ্লাস হাতে লইয়া সে কুঁজোর কাছে আগাইয়া গিয়া ভাবিল, এক গ্লাস জল খাইয়া আজ সে শুইয়া পড়িবে। এই কুঁজোর জল সুষমা আজ নিজের হাতে ধরিয়াছে। জল খাইয়া দরজায় খিল বন্ধ করিয়া হরিশ তাহার বিছানার উপর আসিয়া বসিল। হঠাৎ মনে পড়িল, সুষমার বাক্সে টাকাকড়ি কিছু আছে কি না দেখিতে হইবে। সুষমার চাবি থাকিত বালিশের নীচে। বালিশটা তুলিতেই দেখিল, চাবি ঠিক সেইখানেই রহিয়াছে। চাবি লইয়া হরিশ বাক্স খুলিতে বসিল। কিন্তু বাক্স খুলিয়াই সর্বপ্রথমে তাহার নজরে পড়িল, সোনার যে-কয়টি অলঙ্কার তাহার গায়ে ছিল, মরিবার আগে সব-কয়টি সে খুলিয়া সযত্নে দুইটি সাবানের খালি বাক্সের মধ্যে রাখিয়া গিয়াছে। একটি পানের ডিবার মধ্যে রহিয়াছে ত্রিশটি টাকা, এবং তাহার নিজের কয়েকখানি জামা-কাপড়ের নীচে অত্যন্ত সন্তর্পণে শোয়াইয়া রাখিয়াছে তাহার সেই ডল পুতুলটিকে। আর একটা' বাক্স খুলিয়া দেখিল, তাহাতে কাচের পুতুল, কাচের গ্লাস, পাথরের বাটি, চায়ের কাপ-ডিশ ইত্যাদি সংসারের সরঞ্জাম, এবং সর্বশেষ যে বাক্সটি খুলিল, সেটি মাত্র ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের টুপি, মোজা, পেনি, ফ্রক, রুমাল, কাঁথা ইত্যাদিতে বোঝাই। রঙিন কয়েকটি কাঠের খেলনা, চুষিকাঠি, ঝুমঝুমি, রবারের বল, রবারের বেলুন, সবই সে সঞ্চয় করিয়াছে। কবে তাহার ছেলে হইবে, কি হইবে না, তবু

তাহার জন্য অভাগী কিছুই আর কিনিয়া রাখিতে বাকি রাখে নাই। এত সাধ, এত আকাঙ্খা, কিছুই তাহার পূর্ণ হইল না, সবই সে অপূর্ণ রাখিয়া কত দুঃখে কত কষ্টে যে তাহার নিজের হাতে জীবনের যবনিকা টানিয়া দিয়াছে, সেই কথাই হরিশ আজ এত দিন পরে চুপ করিয়া বসিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিল।

বাক্সগুলি আবার তেমনি বন্ধ করিয়া হরিশ বিছানায় শুইয়া আলো নিভাইয়া দিল।

ঘুমের ঘোরে সহসা তাহার মনে হইল, ঘরের মধ্যে কে যেন গুন গুন করিয়া গান গাহিয়া ছেলে ঘুম পাড়াইতেছে। তন্দ্রাচ্ছন্ন হরিশ চোখ মেলিয়া চাহিতেও পারিল না, উঠিয়া বসিয়া তাড়াতাড়ি আলো জ্বালিবে তাহারও ক্ষমতা রহিল না, চোখ বুজিয়া আধ-ঘুম আধ-জাগ্রত অবস্থায় শুনিতে লাগিল, যেন দোলনা দুলাইয়া সুষমা ঘুমপাড়ানী গান গাহিতেছে। কখনও ধীরে, কখনও জোরে কাঁপিয়া কাঁপিয়া তাহার সে কণ্ঠস্বর হরিশের কানে আসিয়া বাজিতে লাগিল। সে-ধ্বনি যেন অন্ধকার কক্ষতল পরিপূর্ণ করিয়া বায়ুভরে ঘুরিয়া ঘুরিয়া চারিদিক পরিবেষ্টন করিতে লাগিল। কখনও পূর্বে, কখনও পশ্চিমে, কখনও উর্ধ্বে, কখনও নিম্নে, কখনও-বা দূরে, কখনও-বা অতি সন্নিকটে, কখনও বাতায়ন-পার্শ্বে, কখনও-বা তাহারই শয্যাপ্রান্তে তাহারই মৃত পত্নীর সে সকরুণ গীতধ্বনি যেন তাহাকেই শুনাইয়া শুনাইয়া অবরুদ্ধ গৃহমধ্যে গুমরিয়া মরিতে লাগিল।

হঠাৎ এক সময় তাহার তন্দ্রা ছুটিয়া যাইতেই ধড়মড় করিয়া সে বিছানার উপর উঠিয়া বসিল। মনে হইল, সুষমা মরে নাই, তাহার অশরীরী আত্মা যেন এখনও এই গৃহমধ্যে কোথাও লুকাইয়া রহিয়াছে। তাড়াতাড়ি হাত বাড়াইয়া হরিশ আলো জ্বালিল। দেখিল, নিদ্রিত অবস্থায় সমস্ত শরীর কখন তাহার ঘামে ভিজিয়া গিয়াছে, ঘন ঘন রোমাঞ্চ হইতেছে, বুকের ভিতরটা যেন থর থর করিয়া কাঁপিতে শুরু করিয়াছে। ভাবিল, এ ঘরে শোওয়া তাহার আজ উচিত হয় নাই। আতঙ্কে শিহরিয়া হরিশ এদিক-ওদিক তাকাইতে লাগিল। কোথাও কিছুই নাই। ঝাপসা দুই চোখের সুমুখে দেখিল, কড়িকাঠের

লোহার আংটার মধ্যে লাগান সেই দড়ির আধখানা যেন বাতাসে দুলিতেছে।

তৎক্ষণাৎ হরিশ তাহার ঘর হইতে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটিয়া বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। আলো নিভাইবার অবসরও রহিল না, আলোটা ঘরের মধ্যে তেমনি জ্বলিতে লাগিল। দরজাটা দুই হাত দিয়া সজোরে টানিয়া ধরিয়া বাহির হইতে তালা বন্ধ করিয়া যেন সে নিষ্কৃতি পাইল। কিন্তু ঘরের মধ্যে বরং ছিল ভাল, বাহিরে আসিয়াই বা সে যাইবে কোথায়? একবার মনে হইল, ছুটিয়া বাহিরে গিয়া সে পথে ঘুরিয়া বেড়াইবে। আবার ভাবিল, তাহাও নিরাপদ নয়। এমনি ভাবে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া দাঁড়াইয়া আছে, এমন সময় সুমুখে তাকাইতেই দেখিল, দূরে পূর্ব দিকের আকাশটা যেন সিঁদুরের মত লাল হইয়া উঠিয়াছে, ঠাণ্ডা বাতাস বহিতেছে। প্রভাত হইতে আর বিলম্ব নাই!

উন্মাদের মত হরিশ যে কতক্ষণ হাসপাতালের দরজায় পায়চারি করিতেছিল, কে জানে!

বেলা প্রায় আটটার সময় গাড়ি করিয়া থানা হইতে ইন্সপেক্টর আসিলেন। হরিশকে দেখিয়াই তিনি গাড়ি হইতে নামিয়া নমস্কার করিয়া বলিলেন, 'এসেছেন? আসুন।' বলিয়া তাহাকে সঙ্গে লইয়া গিয়া বাহিরের একটা ঘরে বসাইয়া রাখিয়া তিনি ভিতরে চলিয়া গেলেন। ঘণ্টার পর ঘণ্টা অধীর অপেক্ষায় হরিশের সময় যেন আর কাটিতে চাহিতেছিল না।

ভিতর হইতে খবর আর আসে না।

অবশেষে, বেলা তখন প্রায় এগারোটা, কয়েকজন ছাত্র, ইন্সপেক্টর এবং জন-দুই নার্স সঙ্গে লইয়া স্বয়ং ডাক্তার-সাহেব হরিশের কাছে আসিয়া দাঁড়াইলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আপনারই স্ত্রী?'

হরিশ উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, 'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

ইন্সপেক্টর জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তিনি কি গর্ভবতী ছিলেন?'

ঘাড় নাড়িয়া হরিশ জবাব দিল, 'না।'

ইন্সপেক্টর হাসিলেন। কিন্তু ডাক্তার-সাহেব না হাসিয়া নিতান্ত

বিষণ্ণমুখে ছাত্রদের মুখের পানে তাকাইয়া আস্তে আস্তে ইংরাজীতে কি যেন বলিলেন, ভাল বুঝা গেল না; তাহার পর হরিশকে ইঙ্গিত করিয়া কহিলেন, 'আসুন।' কলের পুতুলের মত হরিশ তাহাদের পিছু পিছু দু-তিনটা ঘর পার হইয়া সিঁড়ি ধরিয়া উপরের একটা ঘরে গিয়া দাঁড়াইল।

সুমুখে প্রকাণ্ড একটা কাঁচের টেবিলের উপর, তাহারই সেই সুষমা, এলোচুল কাচের উপর ইতস্তত ছড়াইয়া পড়িয়াছে, সিঁথিতে ডগডগে সিঁদুর, পায়ে টকটকে আলতা। মুখখানি বাদ দিয়া গলা হইতে আগাগোড়া তাহাকে কাটিয়া ছিঁড়িয়া একেবারে তছনচ করিয়া ফেলা হইয়াছে। হরিশ একবার মাত্র সেদিকে তাকাইয়া শিহরিয়া চোখ বুজিল। চোখ দুইটা তখন তাহার জলে ভরিয়া আসিয়াছে। একজন ছাত্র দয়া করিয়া সুষমার আপাদমস্তক একটা সাদা চাদর দিয়া ঢাকিয়া ফেলিল।

ডাক্তার-সাহেব কিন্তু সুষমাকে দেখাইবার জন্য তাহাকে ডাকেন নাই। হরিশকে টেবিলের আরও কাছে আগাইয়া আসিতে বলিয়া নিজের হাতে কাপড়ে-ঢাকা কি একটা বস্তু তুলিয়া ধরিয়া বলিলেন, 'দেখুন। She was pregnant.'

অকস্মাৎ কথাটা শুনিয়া হরিশ চমকিয়া উঠিল। দেখিল, মাংস-পিণ্ডের মত ভ্রূণের মধ্যে অজাত অপরিণত কচি একটি শিশুর সম্পূর্ণ অবয়ব! হাত হইয়াছে, পা হইয়াছে, মাথা, মুখ, নাক দেখিলেই চেনা যায়, চোখ তখনও ফুটে নাই।

সুষমার পেট কাটিয়া উহাকে বাহির করা হইয়াছে।

হরিশের মাথার ভিতরটা কেমন যেন করিতেছিল। অনাহারে অনিদ্রায় অবসন্ন দেহে সে আর দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিল না, টেবিলটা ধরিয়া একবার সামলাইয়া লইয়া সেইখানেই সে বসিয়া পড়িল।

ভঙ্গুর

মোড়টা পার হইয়া গিয়া বড় রাস্তার ফুটপাতে না দাঁড়াইলে বাস পাওয়া যায় না। প্রভাকর মোড় পার হইতেছিল।

পার হইতেছিল নিতান্ত অন্যমনস্কভাবে। অন্যমনস্ক হইবার কারণ, মেজ ছেলেটাকে আজ সে শাসন করিয়াছে। চড়টা সে এত জোরে মারিয়াছে যে আর একটু হইলেই ছেলেটা বোধ করি অজ্ঞান হইয়া পড়িত। মারা তাহার উচিত হয় নাই। মাত্র একটা কাচের গেলাস ভাঙ্গার অপরাধে এত বড় শাস্তি দেওয়া অনুচিত।

ঠুনকো একটা কাচের গেলাস! কদিনই বা থাকে! মানুষের জীবনই ত ঠুনকো!···যাই হক, আজ সে বাড়ী ফিরিবার পথে ছেলেটার জন্য কিছু মিষ্টি কিনিয়া আনিবে। পাকা কলা সে ভালবাসে। আচ্ছা, পাকা কলাই আনিবে।

খানিক আগে এক পশলা বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। পিচ-ঢালা পথ, পিছল! পা টিপিয়া টিপিয়া তখনও সে রাস্তার মাঝামাঝি আসে নাই, বাঁ পাটা পিছলাইয়া যাইতেই হঠাৎ সে পড়িতে পড়িতে সামলাইয়া লইল। সামলাইয়া লইয়া আবার সে চলিতে আরম্ভ করিয়াছে, পশ্চাতে কিসের যেন একটা শব্দে সচকিত হইয়া ফিরিয়া চাহিতেই দেখে, প্রকাণ্ড এক মোটরকার, আর একটু হইলেই পড়িয়াছিল একেবারে তাহার ঘাড়ের উপর! যাক, ড্রাইভারটা ভাল, গাড়ীটাও নূতন, তৎক্ষণাৎ সে ব্রেক কসিয়াছে; নহিলে আজ এই পথের মাঝখানেই···

প্রভাকরের বুকের ভিতরটা ঢিব ঢিব করিতে লাগিল।

রাস্তার এ-পারে তখন পর পর তিনখানা বাস আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। সুমুখে যেটা পাইল তাহারই উপর সে লোকজনের মাঝখানে একটুখানি জায়গা করিয়া লইয়া বসিয়া পড়িল। বুকের

স্পন্দন তখনও থামে নাই। সত্যই যদি সে আজ চাপা পড়িত! জীবন ও মৃত্যুর মাঝখানে একটিমাত্র সেকেণ্ডের তফাৎ। এক সেকেণ্ড এদিক-ওদিক হইলেই আজ সে মরিয়াছিল।...

মরিলে আজ তাহার আর আফিস যাওয়া হইত না। এতক্ষণ হয়ত তাহার মৃতদেহটা ঘিরিয়া লোক জড় হইত। পুলিশ আসিত, লোকজন চেঁচামেচি করিত। এতটুকু জীবন থাকিলে হয়ত তাহাকে হাসপাতালে পাঠান হইত। মুখ দিয়া কথা বাহির হইত না। সে কে, কোথায় তাহার বাড়ী, কি তাহার নাম, কোন আফিসে চাকরি করে, জানিবার কোনও নিদর্শনও ত তাহার কাছে ছিল না। ছিল কিনা তাহাই সে তাহার পকেট হাতড়াইয়া দেখিতে লাগিল।

—এক টুকরা কাগজে একটা ঔষধের নাম। ছোট ছেলেটার কানে পুঁজ হইয়াছে, তাহারই ঔষধ। আজ কিনিয়া আনিতে হইবে। এটা দেখিয়া ত মানুষ চেনা যায় না! কত ছেলেরই ত কানে পুঁজ হয়। আর এক পকেটে একটা কাগজের ওপর লেখা—

কদম-পিসি, হরিদাসী, অবিনাশ, সুরধুনী, ইত্যাদি কয়েকজনের নাম। গত রবিবারে তাহার মৃত পিতার বাৎসরিক শ্রাদ্ধের দিন কাহাকে কাহাকে নিমন্ত্রণ করা হইবে তাহারই একটা তালিকা সে লিখিয়া রাখিয়াছিল।

কিন্তু ইহা দেখিয়াও ত সন্ধান মিলিত না।

—একটা রুমাল। রুমালের এক কোণে লাল সূতায় লেখা আছে 'প্রভাকর'। যাক, নামটা পাওয়া গেল। এ নাম, তাহার স্ত্রী যখন প্রথম শ্বশুরবাড়ী আসে তখন সে নিজের হাতে সূচ দিয়া ফুঁড়িয়া ফুঁড়িয়া তৈয়ারী করিয়াছিল। কিন্তু প্রভাকর নাম ত কলিকাতা শহরে কত লোকের আছে!

যাই হক, পরদিন সকালবেলা হয় ত খবরের কাগজে খবর ছাপা হইত, 'প্রভাকর নামে এক যুবক, কালীঘাট হাজরা রোডের মোড় পার হইতে গিয়া মোটর চাপা পড়িয়াছে। ধরাধরি করিয়া তৎক্ষণাৎ তাহাকে হাসপাতালে লইয়া যাওয়া হয়, কিন্তু কোন প্রকারেই তাহাকে বাঁচাইতে পারা যায় নাই।' স্ত্রী তাহার এ খবর পাইবে না।

কেমন করিয়াই বা পাইবে? মনে মনে তাহার রাগ হইতে লাগিল। সুজাতা খবরের কাগজ পড়ে না কেন?

এই প্রসঙ্গে একটি দিনের একটি ঘটনার কথা তাহার মনে পড়িল। তখন তাহাদের সবে ওই একটিমাত্র ছেলে। খরচ বেশি ছিল না; তাই সে রোজ বাজার করিতে গিয়া একটি করিয়া বাঙলা খবরের কাগজ কিনিয়া আনিত। পড়িবার সময় বেশিক্ষণ পাইত না, স্নানের পর আহারাদি করিয়া আফিস যাইবার সময় স্ত্রীকে বলিয়া যাইত, 'দুপুরে বসে বসে কি আর করবে, খবরের কাগজখানা পড়।'

সুজাতা ঘাড় নাড়িয়া ছেলে কোলে লইয়া হাসিয়া বলিত, 'পড়ব।' কিন্তু পড়া তাহার কোনদিনই হইত না, কাগজখানি যেখানে রাখিয়া যাইত, ফিরিয়া আসিয়া দেখিত ঠিক সেইখানেই আছে।

হঠাৎ একদিন রাত্রে সুজাতা বলিল, 'দেখ, সব কাগজই ত দেখলাম, কিন্তু তোমার ওই কাগজখানা ভারি চমৎকার, এবার থেকে ওইটেই কিনো।' প্রভাকরের খুশী যেন সেদিন আর ধরে না। বলিল, 'লুকিয়ে লুকিয়ে পড় বুঝি?'

'কই না, পড়ি না ত!'

'তবে?'

সুজাতা বলিল, 'কাগজ পুড়িয়ে ছেলের দুধ গরম করতে হয়; ঐ কাগজখানা বেশ, দুড় দুড় করে জ্বলে, ধোঁয়া হয় না, আর অন্য কাগজগুলোর এত ধোঁয়া যে, চোখ জ্বালা করে।'

এই ত তাহার খবরের কাগজ পড়ার ইতিহাস। সুতরাং খবর সে পাইবে কেমন করিয়া! স্ত্রী প্রথমে ভাবিবে, হয় ত আফিসের আজ কাজের বড় চাপ পড়িয়াছে তাই এত আসিতে দেরি। তাহার পর সন্ধ্যা হইবে, তাহার পর রাত্রি। ছেলেটা বলিবে, 'মা? বাবা কোথায়?'

সুজাতা মনের দুঃখে, রাগে, অভিমানে ছেলেটাকে হয় ত মারিয়াই বসিবে, ছেলেটা কাঁদিবে; সুজাতা একবার বারান্দায় আসিবে, একবার ঘরে ঢুকিবে, গভীর রাত্রে কাঁদিয়া কাঁদিয়া অস্থির হইবে, না খাইয়া মনের দুঃখে ছটফট করিবে।

বাস-কণ্ডাকটার ভাড়া চাহিল। প্রভাকরের হাতে তখনও সেই নিমন্ত্রণের তালিকা-লেখা কাগজখানা। সেখানা সে পকেটে রাখিয়া পয়সা বাহির করিতে গিয়া একটা বিড়ি বাহির করিল। তাড়াতাড়ি বিড়িটা পকেটে রাখিয়া একটি সিকি বাহির করিয়া কণ্ডাকটারের হাতে দিয়া বলিল, 'সুদামডি।'

কথাটা বলিয়া ফেলিয়াই তৎক্ষণাৎ পাল্টাইয়া লইয়া বলিল, 'না না, ডালহৌসি স্কোয়ার।' প্রভাকর তাহার এই অন্যমনস্কতার জন্য একটুখানি লজ্জিত হইয়া এদিক-ওদিক একবার তাকাইয়া দেখিল, কেহ তাহাকে লক্ষ্য করিতেছে কি না। কণ্ডাকটার টিকিট ও পয়সা ফেরত দিল। হাত পাতিয়া সে লইল বটে, কিন্তু পকেটে রাখিল না, জানালার ধারে একটুখানি সরিয়া গিয়া বাহিরের পানে তাকাইয়া রহিল।

পথের দুপাশে লোকজনের যাতায়াত, রাস্তার উপর অসংখ্য গাড়ি ঘোড়া, কাহারও কোথাও যেন এতটুকু থামিবার অবসর নাই। বামদিকে তৃণাচ্ছাদিত ময়দান, কোলাহলমুখরিত কর্মব্যস্ত নগরী যেন এখানে আসিয়া একটুখানি হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিয়াছে। সারি সারি গাছে তখন সবুজ কচি পাতার সমারোহ, মাঝে মাছে অজস্র লাল ফুলে ঢাকা কৃষ্ণচূড়ার গাছ, তাহার উপর ঝিলিমিলি রৌদ্র আসিয়া পড়িয়াছে। আজ সবই তাহার কাছে যেন নূতন বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। পৃথিবী যে এত সুন্দর, ইহার পূর্বে সে-কথা প্রভাকরের কোনদিনই মনে হয় নাই।

ইহাকে ছাড়িয়া যাইতে মানুষের কষ্ট হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু ছাড়িয়া যখন সে এখনও যায় নাই, তখন কেন যে সে মিছামিছি সে-কথা ভাবিয়া কষ্ট পাইতেছে কে জানে। প্রভাকর ভাবিল, এখন সে মরিবে না নিশ্চয়ই। তিনটি ছোট ছেলে-মেয়ে, স্ত্রী তাহারা একেবারে নিরবলম্ব অবস্থায় পথে গিয়া দাঁড়াইবে, বিধাতা এত নির্বোধ এত নিষ্ঠুর, এত কঠোর, এত কঠিন কখনও হইতে পারে না।

তাহার স্ত্রীর বয়সী কোনও ভদ্র গৃহস্থের মেয়েকে তিনটি

ছেলেমেয়ে লইয়া পথেপথে ভিক্ষা করিয়া বেড়াইতে সে কখনও দেখিয়াছে কি না তাহাই ভাবিতে লাগিল।

একবার। একবার এমনি একটি মেয়েকে দেখিয়াছিল বটে, কিন্তু সে বোধ করি ভদ্র গৃহস্থের মেয়ে নয়, হয়ত বা দুশ্চরিত্রাও হইতে পারে, কিম্বা হয় ত মিথ্যা বলিয়াছিল। বলিয়াছিল, স্বামী তাহার হঠাৎ বসন্তরোগে মারা পড়িয়াছে, মরিবার সময় কিছুই রাখিয়া যাইতে পারে নাই, তাই আজ সে পথে দাঁড়াইয়াছে।

প্রভাকর ভাবিল, তাহার স্ত্রীর হাতে চারগাছা করিয়া আট গাছা চুড়ি আছে, সোনার চুড়ি, দাম অন্তত বিক্রি করিলে ছশ টাকা হইতে পারে; গলায় একটি মটরমালা, তাহারও দাম দেড়শ টাকার কম নয়···

গাড়ি আসিয়া তাহার আফিসের কাছে দাঁড়াইল। প্রভাকর গাড়ি হইতে নামিয়া ফুটপাথ ধরিয়া চলিতে চলিতে আফিসে গিয়া ঢুকিল। দেখিল, লোকজন সকলেই আসিয়াছে; বড় ঘড়িটার পানে তাকাইয়া দেখিল, দশ মিনিট দেরি হইয়া গিয়াছে। তা হক, আজ সে যে সশরীরে আসিয়া পৌঁছিয়াছে ইহাই যথেষ্ট। বেয়ারা ইহারই মধ্যে টেবিলের উপর দুখানা চিঠি রাখিয়া গিয়াছে। টাইপ-রাইটারের ঢাকা খুলিয়া প্রভাকর চিঠি ছাপিতে বসিল।

Messrs. W. H. Glimmerwarren Fabrik.
Stockholm, Sweden.

'সুইডেন' ছাপিতে গিয়া ছাপিয়া বসিল, 'সুদামডি।'

দূর ছাই! তাড়াতাড়ি রবার দিয়া ঘষিতে ঘষিতে ভাবিতে লাগিল, আচ্ছা মন ত! কোন প্রকারেই কথাটা সে ভুলিতে পারিতেছে না।—ছি। সুদামডি!

সুদামডিতে প্রভাকরের নিজের বাড়ি। শ্বশুরবাড়ি ছিল তাহার বর্ধমান জেলায়। কিন্তু সুজাতার সেখানে নিজের বলিতে আর কেহ নাই। বাস্তুভিটা ছিল, মার মৃত্যুর পর তাহাও গিয়াছে। এবার

যদি ছেলেমেয়ে লইয়া সুজাতাকে কোথাও গিয়া আশ্রয় লইতে হয়, ত—ওই সুদামডিতেই, তাহার নিজের বাড়িতে। কিন্তু বাধা সেখানে অনেক। সুজাতা কেমন করিয়া যে সেখানে গিয়া বাস করিবে কে জানে। দেশের বাড়ি বলিতে আছে মাত্র একখানা মাটির কোঠা বাড়ি, আর দুইটি ছোট ছোট ছেলে লইয়া তাহার বিমাতা। জমি-জমা যে কয় বিঘা আছে তাহাতে অতি কষ্টে তাহাদের দিন চলে। পিতার মৃত্যুর পর বিমাতা কাঁদিয়া কাটিয়া প্রভাকারের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছিল; সুজাতা স্পষ্ট জবাব দিয়াছিল; বলিয়াছিল, 'আমাদেরই কুলোয় না ত তোমাদের দেব কি মা! আমরাই যে শ্বশুরের জমির ধান-চাল কিছু নিচ্ছিনে, এই যথেষ্ট।'

এই লইয়া কথায়-কথায় তুমুল ঝগড়া! সুজাতা বলিয়াছিল, 'এমন সৎ-মার মুখ যেন আমায় আর কখনও না দেখতে হয়।'

মা বলিয়াছিল, 'প্রভাকর আমার সৎ ছেলে, কিন্তু ভগবান না করুন, ওর যদি কখনও কিছু হয়, ত এই সৎ-মার মুখ তোমায় একদিন দেখতেই হবে। তা ছাড়া আর উপায় নেই'

সুজাতা জবাব দিয়াছিল, 'পথে পথে ভিক্ষে মেগে খাব।'

তাহার পর, পিতার শ্রাদ্ধাদি চুকিয়া গেলে, সেই যে তাহারা কলিকাতায় আসিয়াছে, যাওয়া দূরে থাক, সুদামডির নামও তাহারা আর মুখে আনে না।

এই ত অবস্থা!

···প্রভাকর খুব জোরে জোরে টাইপ করিতে লাগিল। চিঠির পর চিঠি! যাক, আফিসে আজ কাজের কামাই নাই। প্রভাকর ভুলিয়া থাকিতে চায়। ঘড়িতে কোন সময় ছয়টা বাজিয়াছে। আফিসের ছুটি! প্রভাকর টেরও পায় নাই।

মেশিনটা ঢাকা দিয়া যখন সে উঠিয়া দাঁড়াইল, মনে হইল, এইমাত্র যেন তাহার ঘুম ভাঙিয়াছে। সমস্ত রাত্রি দুঃস্বপ্ন দেখিয়া প্রভাতে নিদ্রাভঙ্গের পর মানুষের মুখের চেহারা যেমন হয়, প্রভাকরের মুখের অবস্থা ঠিক তেমনি।

ডালহৌসি স্কোয়ার!

চারিদিকে লোকের ভিড়। অধিকাংশই কেরানি। সারাদিন পরিশ্রমের পর পা যেন আর চলে না; তবু বাড়ি ফিরিবার আনন্দে সকলেরই মুখের উপর কেমন যেন একটা প্রসন্নতার চিহ্ন। ট্রাম চলিয়াছে, মোটর ছুটিয়াছে, বাসওয়ালারা চার পয়সায় কতদূর লইয়া যাইবে সেই কথাই বারবার চীৎকার করিয়া সকলকে জানাইয়া দিতেছে।

প্রভাকরের মনে পড়িল, ছেলের ঔষধ কিনিতে হইবে। নানটুর জন্য মিষ্টি, পাকা কলা, একটা কাচের গ্লাস।...আজ আর অনর্থক বাসে চড়িয়া পয়সা খরচ না করিয়া হাঁটিয়া যাওয়াই ভাল। বাড়ি ফিরিয়া সুজাতাকে আজ সে তাহার বিপদের কথাটা বলিবে। শুনিয়া হয় ত সে কোন প্রকারেই তাহার হাসি সামলাইতে পারিবে না। তেমনি গ্রীবা হেলাইয়া, তেমনি দেহ বাঁকাইয়া, তেমনি অপূর্ব অপরূপ লীলায়িত ভঙ্গীতে হাসিতে হাসিতে সে তাহার গায়ের উপর ঢলিয়া পড়িবে। বলিবে হয় ত, 'ছি! এত ভয় তোমার?'

কৌতুকপরায়ণা হাস্যময়ী সুজাতাকে কল্পনা করিয়া প্রভাকর নিজেও একবার হাসিল। ছেলেদের জন্য সন্দেশ কিনিয়া, পাকা কলা কিনিয়া প্রভাকর দেখিল, রাত্রি হইয়া গিয়াছে; এতটা পথ হাঁটিয়া আসিয়া এত বেশি বিলম্ব করা তাহার উচিত হয় নাই। পাশের দোকান হইতে তাড়াতাড়ি একটা কাচের গেলাস কিনিয়া ভাবিল, সুমুখের ডাক্তারখানা হইতে ছেলেটার কানের ঔষধ কিনিয়াই সে বাসে চড়িয়া বাড়ি গিয়া পৌঁছিবে। দেরি যেন আর সহ্য হয় না।

প্রভাকর রাস্তা পার হইতেছিল।

বাঁ দিকের একখানা গাড়ি বাঁচাইতে গিয়া যেমনি সে একটুখানি পিছু হটিয়াছে, এদিক হইতে প্রকাণ্ড একখানা মোটরগাড়ি তৎক্ষণাৎ তাহার গায়ে আসিয়া পড়িল। চারিদিকে একটা হৈ হৈ করিয়া চীৎকার উঠিল। লোকজন ছুটিয়া রাস্তার মাঝে আসিয়া দাঁড়াইল। মোড় হইতে পুলিশ-কনস্টেবল ছুটিয়া আসিল; এবং সেই বিক্ষুব্ধ জনতার মাঝখানে দেখা গেল, রাস্তার ধূলার উপরেই প্রভাকর

তখন পা ছড়াইয়া শুইয়া পড়িয়াছে; বাঁ-হাতটা পিঠের নীচে দুমড়ানো, কাচের গেলাসটা সেইখানেই ভাঙিয়াছে, চোয়াল বহিয়া এক ঝলক রক্ত গড়াইয়া পড়িয়াছে। পায়ের একটা শিরা তখনও থর থর করিয়া কাঁপিতেছিল, কাঁপিতে কাঁপিতে হঠাৎ থামিয়া গেল। ঠোঁট দুইটা একটুখানি নড়িল, কাহাকেও কিছু বলিবার ছিল কি না কে জানে; মুখ দিয়া কথা বাহির হইল না, রক্তরাঙা দাঁত-গুলার পাশ দিয়া কস বাহিয়া দর দর করিয়া আবার খানিকটা কাচা রক্ত বাহির হইয়া আসিল। দেখা গেল, ছেলের রাগ ভাঙাইবার জন্য খাবারের যে ঠোঙাটি সে কিনিয়াছিল, সেটি সে তখন পর্যন্ত হাতছাড়া করে নাই; সন্দেশ কয়টি গড়াইয়া পড়িয়াছে, কিন্তু প্রসারিত দক্ষিণ হস্তের দৃঢ় মুষ্টির মধ্যে শালপাতার ঠোঙাটি সে তখনও তেমনি ধরিয়া আছে।

চক্ষুদান

কার্তিক পূজা···

তিন ভাইএর এজমালি। দু-ভাই ফুল দিবে, নৈবেদ্য দিবে, পূজার যাবতীয় খরচ তাহাদেরই। মেজ ভাই গরিব। বলে, 'আমার লবডঙ্গা! আমি আবার দেব কি? আমি যা জানি তাই। ঠাকুর গড়ব, রাঙাব —বাস, ছুটি!'

তা বিপিনের বাহাদুরি আছে। কাহারও কাছে কোনও দিন শিখে নাই, সাকরেদি করে নাই, অথচ খড়-মাটি দিয়া এমন ঠাকুর সে গড়ে, আর এমনি রাঙায়, যে দশখানা গাঁয়ের কারিগর আসিয়া তারিফ করে। বলে, 'বাঃ! বাউনের ছেলে, তা হাত বটে আজ্ঞে!'

বিপিন আর এ-কটা দিন খাওয়া দাওয়ার অবসর পায় না। পুরু কাচের চশমা জোড়াটি ছাতা-পড়া কাগজের খাপ হইতে বহু-কাল পরে বাহির হয়, দড়ি দিয়া বেশ করিয়া সেটি সে কানের সঙ্গে আঁটিয়া বাঁধে, আর চব্বিশ ঘণ্টা শিব-দেউলের পাশে ছোট সেই কার্তিক কুঠরিতেই পড়িয়া থাকে। কাঁধে করিয়া টুমনি-জোড়ের ধার হইতে তাল তাল মাটি সে নিজেই বহিয়া আনে, দু-চার আঁটি খড়, পুরনো ছেঁড়া ন্যাকড়া, বাঁশের বাঁখারি, এখান-ওখান হইতে জোগাড় করে, কাঠাম বাঁধা হয়, এবং সেই খড়-কাঠের কাঠামের উপর দেখিতে দেখিতে চমৎকার এক কার্তিক ঠাকুর গড়িয়া ওঠে।

কেহ কাছে গিয়া দাঁড়াইলে বিপিন তাহার মুখের পানে তাকাইয়া ফোকলা-দাঁতে খিলখিল করিয়া হাসে; একটুখানি দূরে সরিয়া গিয়া বলে, 'কেমন হচ্ছে? একাই সব। খড়ের কুটোটি কেউ এদিক ওদিক করে দেয়নি বাবা—হেঁ হেঁ···'

এক-মৃত্তিকা শেষ হয়, মাটির 'বনকে' ন্যাকড়া ভিজাইয়া দু-মৃত্তিকার পালিশ চলে। পনের-ষোল বছরের ছেলে চরণ, মাথায় টেরি কাটিয়া কোঁচার খুঁটটি গায়ে দিয়া ও-পাড়ার তাঁতি ঘরে তামাক খাইতে যায়, পথে একবার কার্তিক-কুঠরির দরজায় দাঁড়াইয়া বলে, 'বাবা, খেতে যাও, মা ডাকছে।' বলিয়াই আবার চলিবার উপক্রম করে।

মুখ না তুলিয়াই বিপিন ডাকে, 'শোন, শোন!'

'কি বলছ কি?' বলিয়া অনিচ্ছাসত্ত্বেও চরণ ফিরিয়া দাঁড়ায়।

ছোট একটা সাপের বাচ্ছা গড়িতে গড়িতে বিপিন বলে, 'শোন, আয় উঠে আয়।'

চরণের দেরী আর সহ্য হয় না, উঠিয়া আসিয়া বলে, 'কি বলছ, বল ঝপ করে।'

সাপের বাচ্চাটি ময়ূরের দুটি ঠোঁটের ফাঁকে ধরাইয়া দিয়া বিপিন ঘাড় বাঁকাইয়া এপাশ ওপাশ ঘুরিয়া ফিরিয়া বার কতক প্রথমে বেশ ভাল করিয়া দেখে, তাহার পর বলে, 'আচ্ছা বলত দেখি চন্না, রখিতপুরের ময়ূরটাও ত দেখেছিস, সেই যে এঁকে দিয়েছি তোর মামার বাড়ির বৈঠকখানার দেয়ালে, আর এটাও ত দেখছিস, কোনটা ভাল হয়েছে বল দেখি ঠিক করে? ঠিক বলবি, ঠি—ক একেবারে কাঁটায় কাঁটায়...।' চরণের মুখের পানে বিপিন তাহার চশমা-পরা চোখ দুইটি তুলিয়া সাগ্রহে তাকাইয়া রহিল।

চরণ ফট করিয়া বলিয়া বসিল, 'সেইটে, রখিতপুরের সেইটে।'

চশমার ভিতর বিপিনের চোখ দুইটা হঠাৎ অত্যন্ত বড় হইয়া উঠিল। 'যা যা যা তবে সেখানেই দেখগে যা, রখিতপুরেই যা—ভাগ!' চরণের ঘাড়ে ধরিয়া বিপিন তাহাকে এমন ঠেলিয়া দিল যে সে একেবারে রাস্তায়।

আইবুড়ো মেয়েটা তখন ভাঙা কাঁশি হইতে ভাতের ডেলাগুলা ছুঁড়িয়া ছুঁড়িয়া মুখে পুরিতেছিল, চোখ হইতে চশমাটা খুলিয়া বিপিন সেইখানে গিয়া তামাক টানিতে টানিতে বলিল, 'কি তরকারী? পুষ্প!'

পুষ্প সোহাগে গদগদ হইয়া নাকি-সুরে বলিল, ছাঁই—পুঁস্তু ভাঁজা আর টক…'

বিপিন বলিল, 'দেখেছিস ঠাকুর আমাদের? কার্তিক?… ময়ুরে-চড়া কার্তিক এ-বছর?' আরও কি সে বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু পুষ্পর মা হঠাৎ কোথা হইতে একেবারে রণচণ্ডীর মত আসিয়া হাজির হইল। 'রাখ রাখ, তোমার হুঁকো রাখ! ক'লাখ টাকা পাবে যে ঠাকুর গড়ছ দিন-রাত? ঘরে যে কাল থেকে উনান জ্বলবে না তার ঠিক রাখ?'

বিপিন উবু হইয়া বসিয়াছিল, হুঁকাটা মুখের কাছ হইতে একটুখানি সরাইয়া লইয়া পুষ্পর মায়ের দিকে তাকাইয়া হি হি করিয়া হাসিতে লাগিল, 'দেখেছিস? দেখেছিস ঠাকুর কেমন গড়েছি?'

'আঃ মর!' বলিয়া পুষ্পর মাও হাসিয়া ফেলিল। 'এমন মানুষ ত কখনও দেখিনি মা! নাও ওঠ, চান কর, করে যা'হক চারটি পিণ্ডি গেল, গিলে যাও কোথা যাবে যাও, বেরও তুমি ঘর থেকে!'

এতক্ষণ পরে পুষ্প একটা ভাতের ডেলা কোৎ করিয়া গিলিয়া হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিয়া বসিল, 'ঠাকুর এখনও রাঙান হয়নি বাঁবাঁ—?'

মুখখানা অত্যন্ত কদাকার করিয়া বিপিন বলিয়া উঠিল, 'এঁঃ! এতক্ষণে রাঙান হয়নি বাঁবাঁ—? কেন দেখে আসতে পারিস না? ড্যাবড়া ড্যাবড়া চোখ দুটো দিয়ে দেখে আসতে পারিস না?' পুষ্প আর কিছু না বলিয়া হেঁট মুখে ভাত লুফিতে লাগিল।

'ও কি খাওয়া লো তোর? ও কি খাওয়ার ছিরি?' বলিয়া মা তাহার পিঠে একটা কিল মারিয়া ভিজে গামছাটা বিপিনের কাঁধের উপর ছুঁড়িয়া দিয়া বলিল, 'যত নষ্টের গোড়া এই তুমি! আদর দিয়ে মেয়ের মাথাটা খেলে ত? নাকে কথা কইছে, আ-মর!'

হুঁকাটা এইবার হাত হইতে নামাইয়া বিপিন স্নান করিতে গেল।

ঠাকুরের গায়ে রং চলিতেছিল। টানাটানা এক জোড়া ভুরু হইল, চোখের পাতা, চোখের তারা, সবই হইয়া গেল, বাকি রহিল শুধু এক জোড়া গোঁফ। ময়ূরের চোখ দিয়া, পেখমের রং ফলাইয়া, বিপিন যখন কার্তিকের গোঁফে হাত দিল, বেলা তখন প্রায় ডুবিয়া আসিয়াছে।

কার্তিক-কুঠুরির দরজা হইতে বিপিন ডাকিল, 'পুষ্পু পুষ্পু!'

ডাক শুনিয়া নাকি-সুরে পুষ্পর জবাব আসিল, 'কিঁ—!'

'ঝপ করে একটা পিদিম আন দেখি, পিদিম!' প্রদীপ যখন আসিল গোঁফ দুইটা বিপিন তখন প্রায় শেষ করিয়া ফেলিয়াছে। বাঁ হাতে প্রদীপটা তুলিয়া ধরিয়া একাগ্রমনে বিপিন একবার পিছাইয়া একবার আগাইয়া নানান ভঙ্গীতে কার্তিকের মুখখানি দেখিতে লাগিল। কাছে লোকজনও কেহ নাই যে তাহাকে ডাকিয়া দেখায়!

দূরের গ্রাম হইতে শ্রাদ্ধশান্তি সারিয়া ঈশান ঠাকুর বাড়ি ফিরিতেছিল, কাঁধের দুই পাশে গামছায় বাঁধা দুইটা পুঁটলি এক হাতে পাতায়-জড়ান কয়েকটি পুঁটি মাছ।

'কি হে, তামাক খাচ্ছ নাকি? ঠাকুর গড়া হচ্ছে? বেশ বেশ—!'

সাগ্রহে বিপিন তাহার বাঁ-হাতের প্রদীপটা তুলিয়া ধরিয়া ডাকিল, 'এস এস এস, এস দেখি, শোন শোন—'

ঈশান ঠাকুর রাস্তার উপরেই দাঁড়াইয়া পড়িল।

'আচ্ছা, দেখ ত, দেখ ত ঠাকুর, কার্তিকের এই গোঁফ-জোড়াটা দেখ ত ওইখান থেকে ঠিক হল কি না—'

ঈশান-ঠাকুরের কাঁচা পাকা ভুরুর লোমে ও চোখের পাতায় জড়াজড়ি হইয়া গিয়াছে। বয়স হইয়াছে কিন্তু তাহার চোখের জ্যোতি কমে নাই, গহ্বরের ভিতর মাণিকের মত কোটরপ্রবিষ্ট চোখ দুইটা তাহার যেন অন্ধকারেও জ্বল জ্বল করে। বার কতক ঘাড় বাঁকাইয়া কপাল কুঁচকাইয়া ঠাকুর বলিল, 'গোঁফ? দেখ বাঁ দিকেরটা একটু ছোট হল না, ডানদিকের চেয়ে?'

'ছোট? আচ্ছা দাঁড়াও।' কালো কালির মোটা তুলিটা বিপিন তখনও হাতছাড়া করে নাই। কার্তিকের মুখের কাছে মুখ লইয়া গিয়া প্রদীপ ধরিয়া বাঁ দিকের গোঁফের উপর সে আর এক পোঁচ কালি বুলাইয়া দিল। 'এইবার?'

ঘাড় নাড়িয়া ঈশান ঠাকুর বলিল, 'উঁহুঁক! এবার যেন এই দিকেরটা ছোট হয়ে গেল।'

'আচ্ছা আচ্ছা দাঁড়াও।' বিপিন উলটা দিকে আবার তুলি চালাইল।

ঈশান বলিল, 'ও কি করলে? ওর চেয়ে আগেই ভাল ছিল।'

'না হে না—এই দেখ তুমি, ঠিক করে দিচ্ছি।' বিপিন তুলিটা ধীরে-ধীরে আর একবার দুই দিকেই বুলাইয়া দিয়া প্রদীপটা সেইখানেই নামাইয়া রাখিয়া পিছু হাঁটিয়া বলিল, 'দেখ, ঠিক হয়ে গেছে, বাস!'

ঈশান এবারেও ঘাড় নাড়িয়া খুঁৎ খুঁৎ করিতে লাগিল। 'তার চেয়ে তুমি কাল ঠিক কর, বুঝলে? নাও, তামাক খাও দেখি একবার! অন্ধকার হয়ে গেছে, আজ আর তুলি-টুলি ধর না।'

বিপিন আবার কার্তিকের কাছে আসিয়া বসিল। 'হয়নি ঠিক? বেশ ভাল করে দেখ দেখি?' মাটিতে নামান কালো কালির খোলার উপর হাতের তুলিটা নাড়িতে নাড়িতে বিপিন একবার কার্তিকের মুখের পানে একবার ঈশান ঠাকুরের দিকে ঘন ঘন তাকাইতে লাগিল।

ঈশান ঠাকুর মাথার টিকি নাড়িয়া বলিল, 'নাঃ, সুবিধা মতনটি ঠিক হল না এখনও বিপিন!'

'হল না?'

'নাঃ!'

ঝুম মারিয়া হেঁটমুখে কিয়ৎক্ষণ ভাবিয়া বিপিন আবার জিজ্ঞাসা করিল, 'হল না তাহলে, কি বল?'

ঈশান বলিল, 'জ্বালাতন দেখছি! ক'বার বলব?'

'তবে এ-এ-এ—এই নাও! হল?' কালির কাটরা হইতে

মোটা তুলিটা তুলিয়া লইয়া নিমেষের মধ্যে হা হা করিয়া নিষেধ করিতে না করিতে কার্তিকের সারা মুখখানা তুলি চালাইয়া বিপিন একেবারে ভূতের মত কালো অন্ধকার করিয়া দিল।

'করলে কি? করলে কি?' ঈশান ছুটিয়া তাহাকে ধরিবার জন্য উপরে উঠিয়া আসিতেছিল, বিপিন সজোরে তাহার মুখের উপর কালি-সমেত তুলিটা ছুঁড়িয়া দিয়া বলিল, 'তোমার মাথা!'

থু থু করিয়া থুতু ফেলিয়া হাত দিয়া মুখের কালি ঘুচাইতে গিয়া ঈশান ঠাকুরের মুখখানাও কম কিম্ভূতকিমাকার হইয়া উঠিল না। বোকার মত হতভম্ব হইয়া সে দাঁড়াইয়া রহিল।

বিপিন আর মুখে কোনও কথা বলিল না, প্রদীপটা পায়ে করিয়া উল্টাইয়া দিয়া দরজার শিকলি তুলিয়া হন হন করিয়া আপনমনেই ঘরের দিকে চলিয়া গেল। ঘরে গিয়া দেখে তাহার অপরিসর উঠানের উপর তখন এক প্রলয় কাণ্ড বাধিয়াছে। দুভাই-বোনে ভীষণ ঝগড়া!

পুষ্পর খাটো চুলের মুঠি ধরিয়া চরণ তাহাকে চরকির মত সারা উঠানময় ঘুরাইয়া লইয়া বেড়াইতেছে, আর পুষ্প চেঁচাইতেছে, 'দেঁখ মা দেঁখ! গাল দেঁব এবারে—দেঁখ···'

চরণ বলিতেছে, 'তুই খেয়েছিস কিনা বল হারামজাদী কোথাকার!'

বিপিন আর কোন কথা না বলিয়া দুজনার পিঠে গুমাগুম কিল বসাইয়া দিয়া তাহাদের ছাড়াইয়া দিল।

চরণ তাহাকে যৎপরোনাস্তি গালাগালি দিতে দিতে ছুটিয়া পালাইল। পুষ্পর কান্না আর থামিতে চায় না!

'লঙ্কা খাঁই আমি কঁখনও! গাঁছে তিনটি স্থঁয্যিমুণি লঙ্কা ধরেছিল, নাই, তাঁ আমি কি জানি—!'

গিন্নি কোথায় ছিল, ছুটিয়া আসিয়া যত দোষ বিপিনের ঘাড়ে চাপাইয়া দিয়া বলিল, 'ওই ত জান! দিলে ত কাঁদিয়ে? এলেন এতক্ষণে ঠাকুর গড়ে! কেন মোড়ল-পাড়ার দিকে একবার যেতে হত না? ঘরে একটি চাল নেই, তা কি টোকা-পেছে হাতে

নিয়ে দোরে দোরে ভিখ মেগে বেড়াব আমি?—না কি? আ-মর! এমন পুরুষ-বেটাছেলের মুয়ে ঝাঁটা।' এমনি আরও সব কত-কি সে বলিতে বলিতে আপনমনেই গর্জাইতে লাগিল।

সুমুখে চালার এককোণে বাঁশের আলনায় বিপিনের পোষাকী ছাতা চাদর জামা হরদম ঝুলিত। ছেঁড়া খাকির জামাটা সে তৎক্ষণাৎ গায়ে দিয়া আধ-ময়লা চাদরটা কাঁধে ফেলিয়া লইল, ছাতিটা বগল-দাবা করিয়া জুতার সন্ধানে একবার এদিক ওদিক তাকাইল; চটিজুতা একজোড়া তাহার ছিল, কিন্তু পুত্র চরণের কৃপায় সব সময় তাহাদের খুঁজিয়া পাওয়া যাইত না, খুঁজিতে গেলে দেরি হইবার সম্ভাবনা তাই, সে খালি পায়েই ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল।

মোড়ল-পাড়ায় যাইবার পোষাক ইহা নয়। গিন্নি বলিল, 'ছাতা চাদর নিয়ে মরতে কোথায় যাওয়া হচ্ছে শুনি?'

কিন্তু কথার তখন কে-ই বা জবাব দেয়! কে যেন কাহাকে বলিতেছে এমনি অগ্রাহ্য করিয়া সন্ধ্যার অন্ধকারে হন হন করিয়া বিপিন যে কোথায় চলিল কাহাকেও কিছু বলিয়া গেল না।

নিতান্ত ছোট একটি শহরের সংকীর্ণ পথে আলোর বালাই নাই। আসন্ন শীতের সন্ধ্যায় অপর্যাপ্ত ধুলা উড়াইয়া শহরের ফেরত মাল-বোঝাই গরুর গাড়ীগুলি ঘন ঘন যাওয়া আসা করে। গাড়ীর নীচে কেরোসিনের কুপি জ্বলে। সন্ধ্যার অন্ধকারে পথের ধুলা নজরে পড়ে না, কিন্তু পথযাত্রী পথিকের নিশ্বাস বন্ধ হইয়া আসে। একসঙ্গে চারখানা গাড়ী পার হইতেছিল। পথ বন্ধ। চাদরের একটা খুঁট নাকে চাপিয়া ধরিয়া পথের এক পাশে বিপিন সরিয়া দাঁড়াইল।

পাশেই একটা বড় বাড়ীর দরজায় তখন সবেমাত্র একটা ঘোড়ার গাড়ী খোলা হইয়াছে। একপাশের একটা বাতি তখনও মিট মিট করিয়া জ্বলিতেছে, আর একটা বাতি লইয়া সহিস বোধ করি ঘোড়া দুইটা আস্তাবলে রাখিতে গিয়াছে।

বিপিন দেখিল, বাড়ীর সদর দরজাটা খোলা। সুমুখেই বসিবার

ঘর। মেঝের উপর ফরাস বিছাইয়া বাবু বসিয়া আছেন। লোকটা যেমন মোটা তেমনি কদাকার।

'কি চাই?'

বিপিন বলিল, 'আজ্ঞে এক গ্লাস জল!'

বাবু ডাকিলেন, 'সদা। সদা।' চাকর আসিল, জলও আসিল। ঢক ঢক করিয়া গ্লাসের জলটা খাইয়া ফেলিয়া দেওয়ালের একপাশে ছাতিটা নামাইয়া রাখিয়া বিপিন মেঝের উপরেই উবু হইয়া বসিল। বলিল, 'কলকেটা একবার—'

বাবু বলিলেন, 'তামাক খাবেন?…আপনি?'

'আমি ব্রাহ্মণ।'

ঘরের কোণে একটা হুঁকা দেখাইয়া দিয়া বাবু তাঁহার নিজের গড়গড়া হইতে কলকেটা তুলিয়া মাটিতে নামাইয়া দিলেন।—'নিন।'

বিপিন আপনমনেই অনেকক্ষণ ধরিয়া তামাক টানিল। তামাক টানিতে টানিতে কি যেন সে ভাবিতেছিল, কি যেন বলিবার জন্য অনেকক্ষণ হইতেই সে উসখুস করিতেছিল! মুখ হইতে ধোঁয়া ছাড়িতে ছাড়িতে ঘরের দেওয়াল এবং কড়িকাঠের দিকে বার কতক তাকাইয়া বিপিন বলিল, 'আচ্ছা, এ-ঘরে আপনি রং করান না কেন? করালেই ত পারেন।' বাবু জবাব না দিয়া কয়েকটা নথিপত্র উল্টাইতে লাগিলেন।

বিপিন বলিল, 'রং আমি খুব ভালই করতে পারি। দেখুন, কলমি-লতার উপর এমনি গোলাপ ফুল আমি এঁকে দেব যে দেখে একেবারে তাক লেগে যাবে, বুঝলেন?'

বাবু একবার মুখ তুলিয়া চাহিলেন, কিন্তু বিপিন তখন কথা বন্ধ করিয়া আবার তামাক টানিতে শুরু করিয়াছে। অনেকক্ষণ দুজনেই চুপচাপ।

হুঁকাটা বিপিন হাত হইতে নামাইয়া বলিল, 'দেখুন, বাইরের ওই বারান্দায় আপনার লোকজন কেউ শোয় কি?'

মুখ না তুলিয়াই বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কেন?'

'রাত্তিরে আর কোথায়···তাই বলি, এইখানেই একটু···আর শীত তেমন বেশি পড়েনি এখনও, কি বলেন?' বলিয়াই বিপিন সেখান হইতে উঠিল। বাহিরে বারান্দার একপাশে একটা চৌকি পাতা ছিল, কিয়ৎক্ষণ পরে মনে হইল যেন সে তাহার ছেঁড়া চাদরটা দিয়া চৌকির ধূলা ঝাড়িতেছে।

ভিতর হইতে বাবু ডাকিলেন, 'ওহে···ওই···ও লোকটি, শোন! শোন!'

'আমায় ডাকছেন?' বিপিন দরজার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল।

বাবু তখন উঠিয়া দাঁড়াইয়াছেন। 'হ্যাঁ। খাবে এস! বাইরে ঠাণ্ডায় হিমে পড়ে থেক না, এই ঘরে আমার ঠাকুর শোয় এইখানে শোবে।'

তা বাবুটি লোক ভাল। দুজনেই কাছাকাছি খাইতে বসিল।

রাঁধুনী বামুন একজন পরিবেশন করিতেছিল। বিপিনের খাওয়া আর শেষ হয় না! এমন খাওয়া সে জীবনে খুব কমই খাইয়াছে।

ঠাকুর জিজ্ঞাসা করিল, 'আপনাকে আর কিছু দেব কি? ভাত?'

দ্বিতীয় বারের ভাতগুলা তখন তাহার প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে। মুখ তুলিয়া বলিল, 'না। কিন্তু চমৎকার রেঁধেছ ভাই —বাঃ! বামুনের ছেলে, রাঁধতে-বাড়তে আমিও এক-আধটু জানি ·· তা বেশ, বেশ···কই···অম্বল আর-একটুখানি, বুঝলে?···খুব সামান্য এই এতটুকুন···বাস!' ঠাকুর অম্বল আনিতে গেল।

বিপিনের কথাটা বাবু শুনিয়াছিলেন। বলিলেন, 'রাঁধতে টাঁধতে জানেন নাকি আপনি?'

ঘাড় নাড়িয়া বিপিন বলিল, 'আজ্ঞে হ্যাঁ, খুব ভাল। পোলাও, মাংস টাংস খুব ভালই রাঁধতে পারি আমি!'

'তবে এক কাজ কর, বুঝলে?' বাবুর 'আপনি' ও 'তুমি'তে জড়াইয়া যাইতেছিল। জলের গ্লাসটা হাত হইতে নামাইয়া বাবু বলিলেন, 'ভাত রাঁধার কাজ টাজ করতে পার ত, করতে পার এইখানেই। আমার ঠাকুরটা বাড়ি যাব বাড়ি যাব করছে।···এই যে! কালী, বাড়ি কি তুমি যাবে সত্যিই?'

ঠাকুর বিপিনের জন্য অম্বল আনিয়াছিল। বলিল, 'আজ্ঞে সে ত আমার বলাই আছে।'

বিপিন অম্বল দিয়া ভাত মাখিতে মাখিতে হেঁটমুখে কি যেন ভাবিতে লাগিল, তাহার পর হঠাৎ একসময় মাথা নাড়িয়া বলিয়া উঠিল, 'আচ্ছা তাই তাই! মাইনে?'

বাবু বলিলেন, 'ছ'টাকা! আর খাওয়া-পরা—'

বিপিন রাজি হইল। বলিল, 'আচ্ছা তবে কাল থেকেই। কিন্তু এ-চাকরি তাহার পনর দিনের বেশি টিকিল না।

শহরটি তাহাদের গ্রাম হইতে বেশি দূরে নয়, আদালতে রেজেস্ট্রী আফিসে গাঁয়ের লোক হরদম যাওয়া-আসা করে। পাছে কাহারও সঙ্গে মুখোমুখি দেখা হইয়া যায় ভাবিয়া বিপিন ঘর হইতে বাহির হয় না। অনভ্যস্ত হাতে রাঁধিতে তাহার দেরি হয়, এক ঘণ্টার জায়গায় চার ঘণ্টা লাগে। বাবু বলেন, 'কি হে বিপিন, অত দেরি কেন?,

ভাতের থালাটি তাড়াতাড়ি আনিয়া তাঁহার সুমুখে ধরিয়া বিপিন বলে, 'দাঁড়ান, ভাত কি অমনি যেমন তেমন করে দিলেই হল! একটু সাজিয়ে গুছিয়ে মানানসই করে তবে ত···?'

বাবু বলেন, 'না, যেমন হয় তেমনি দিও। ভাতের থালায় ফুল কাটে না, বুঝলে?' বিপিন তবু দেরি করে।

সেদিন বেলা একটুখানি বেশিই হইয়াছিল, বিপিনের রান্নাও সেদিন সুবিধামত হয় নাই। বাবু বলিলেন, 'চট করে, কিছু খাবার কিনে নিয়ে এস, যাও!'

সেদিন হাট বার। খাবার কিনিতে হাটতলায় যাইতে হয়, অথচ তাহাদের গ্রাম হইতে অনেকেরই সেদিন হাটে আসিবার সম্ভাবনা। বিপিন পয়সা হাতে লইয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

বাবু বলিলেন, 'যাও—'

বিপিন এদিক ওদিক তাকাইতে লাগিল।

'দাঁড়িয়ে রইলে যে?'

বিপিন আমতা আমতা করিয়া বলিল, 'চাকর—'

বাবু বোধহয় একটুখানি রাগিয়াছিলেন। বলিলেন, 'তুমি নবাব নাকি ?'

বিপিনের রাগ হইতে দেরি হইল না, মুখের উপর স্পষ্ট জবাব দিয়া দিল, 'আমি পারব না যেতে—'

বাবু বলিলেন, 'পারবে না ত চলে যাও—'

বিপিন সেই মুহূর্তেই যাইবার জন্য প্রস্তুত হইল। বাবুর পায়ের কাছে পয়সাগুলি ফেলিয়া দিয়া, বাহিরের ঘরে গিয়া জামা পরিল, চাদর লইল এবং ছেঁড়া ছাতাটি বগলে করিয়া বাবুর কাছে আসিয়া বলিল, 'দিন মাইনে—' পনর দিনের মাহিনা তিনটি টাকা বাবু তৎক্ষণাৎ তাহার কাছে ফেলিয়া দিয়া বলিলেন, 'খবরদার আর আমার দোর মাড়িও না বলে দিচ্ছি।' রাগে আর বাবু বেশি কিছু বলিতে পারিলেন না। বিপিনেরও রাঁধা ভাত রান্নাঘরেই পড়িয়া রহিল। তিনটি টাকা মাত্র পকেটে ফেলিয়া হাসিতে হাসিতে সে বাহির হইয়া গেল।

'আঃ বাঁচলাম বাবা—ভাত রাঁধার চাকরি আবার মানুষে করে ?'

সটান কলকাতায়···রাঁধিতে হয়ত এইখানেই রাঁধিবে।

না আছে একটা চেনা মুখ, না আছে কিছু।

তবে একবার কালিঘাটে চান করিয়া আসা ভাল। অনেক পাপ সে করিয়াছে। না হইলে কি আর ঘরছাড়া হয়! স্নান করিয়া মন্দিরে পূজা দিয়া বিপিন পথে পথে ঘুরিতেছিল। দুপাশে দোকান, বাড়িঘর, লোকজন! চারিদিক গুলজার! পাশেই একটা বাক্সের দোকানে টিন পিটান হইতেছে। তাহার পাশেই একটা ডুগি তবলার দোকান। বাঃ, লোকটা বেশ তবলা বাজায় ত। বিপিন পথে দাঁড়াইয়া খানিকক্ষণ শুনিল। ঘাড় নাড়িয়া তারিফ করিল, বাঃ, বেশ হাত!

পটো-পাড়ায় তখন জগদ্ধাত্রী গড়ার ধূম পড়িয়া গিয়াছে। ছোট বড় নানা রকমের ঠাকুর কতক রাস্তায়, কতক বা চালায়, কতক শুকাইতেছে, কতক-বা রং চড়িতেছে। কারিগর তখন একটি প্রতিমার কাপড়ের উপর রং ফলাইতেছিল। রাস্তার ধারে দাঁড়াইয়া

বিপিন একদৃষ্টে তাহাই দেখিতে লাগিল, 'উঁহু ! ও কি হল ? ওখানে ত ও-রং হবে না !'

কারিগর হঠাৎ মুখ তুলিয়া চাহিয়া বলিল, 'কে হে তুমি ?'

বিপিন তখন ছেঁড়া জামার আস্তিন গুটাইতেছে। বলিল, 'দেখবে ? দেখিয়ে দিচ্ছি।' চালার উপর চড়িয়া গিয়া বলিল, 'দাও তুলি !'

কারিগর প্রথমে তুলি দিতে ইতস্তত করিতেছিল, কিন্তু বিপিন ছাড়িবার পাত্র নয়, একরকম জোর করিয়াই হাত হইতে তুলিটা কাড়িয়া লইয়া কাপড়ের উপর রং ফলাইতে বসিয়া গেল।

কারিগর দেখিল, লোকটা তুলি চালাইতে জানে। এবং বোধ-করি বেশ ভালই জানে। বলিল, 'করবে, তুমি কাজ করবে !'

বিপিন ঘাড় নাড়িয়া বলিল, 'করব '

কারিগর বলিল, 'ঠিকের কাজ, পিতিমে পিছু চার আনা।'

'আচ্ছা তাই তা—ই !' বিপিন পকেট হইতে তাহার চশমা-জোড়াটি বাহির করিয়া কানের সঙ্গে আঁটিয়া বাঁধিল। বলিল, 'যা হক কিছু পেলেই বাঁচি।' বলিয়াই সে আবার তুলি চালাইতে লাগিল। তা বিপিনের বাহাদুরি আছে। একসঙ্গে চারটি প্রতিমা রং করিয়া তুলি ছাড়িয়া সে যখন মুখ তুলিয়া চাহিল, প্রতিমা রাঙাইতে হইলে তখন আলোর দরকার। বলিল, 'কিছু খেতে হবে যে দাদা।

কারিগর অঙ্গুল বাড়াইয়া বলিল, 'হোটেল। এই যে, ওই গলির মোড়েই।'

বিপিন উঠিয়া দাঁড়াইল। চালা হইতে পথে একবার নামিয়াও গেল। কিন্তু পুনরায় ফিরিয়া আসিয়া হাত পাতিয়া বলিল, 'কিছু চাই ত দাদা খেতে হলে ?'

'হুঁ' চার আনা পয়সা দিয়া কারিগর বলিল, 'চৌদ্দ পয়সা লাগে।'

এবার কাজটা তাহার মনের মত। আপন মনেই ঠাকুর গড়ে, রং দেয়, হোটেলে খায় আর সেইখানেই পড়িয়া থাকে। বিপিনের দিন মন্দ কাটে না। ঘরে সেদিন পনরো টাকা পাঠান হইয়াছে।

মাসের শেষে আরও কিছু পাঠাইতে পারিবে বলিয়া মনে হয়। চরণ চিঠি দিয়াছে, তাহারা ভালই আছে।

ঠাকুর গড়িতে গড়িতে বিপিন আবার গানও গায়। ছোট একটা হুঁকাও সে সেদিন কিনিয়া আনিয়াছে। অবসর সময়ে বসিয়া বসিয়া তামাক টানে। এক এক সময় নির্জনে যখন বসিয়া থাকে, রং-দেওয়া প্রতিমাগুলির মুখের পানে একদৃষ্টে তাকায়, নিজেই নিজের বাহাদুরির তারিফ করে। তারিফ করে আর হাসে।

কারিগর দেখিতে পাইলে বলে, 'ঠাকুরের কি মাথা গরমের ছিট আছে নাকি?'

বিপিন রাগিয়া ওঠে, বলে, 'মাথা গরম কি? ছিট আবার কিসের?'

কারিগর বলে, 'বেশ বেশ সরস্বতী পূজো আসছে, বায়না নেব কিন্তু দু'শ ঠাকুবের, পারবে ত?'

তামাক টানিতে টানিতে বিপিন বলে, 'খুব খুব—দু'শ ছেড়ে দু'হাজার নাও। এ বাবা বিপিন ঘটক, আর কেউ নয়, হেঁ-হেঁ—' বলিয়াই সে হো হো করিয়া হাসিতে থাকে।

দু'শ সরস্বতীর বায়না...বিপিনের খাওয়া পরার অবসর নাই। নিজেই সব করে, বলে, 'শরৎ তুমি বসে থাক।'

শরৎ বলে, 'বেশ বেশ—'

সময় কম। বিপিন দিনেও কাজ করে, আবার রাত্রেও। একটির পর একটি রং চলিতে থাকে,—দু'শ ঠাকুর চালার উপর সাজান। পাশেই স্যাকরার দোকানের ঠুকঠাক আওয়াজ বন্ধ হইয়া যায়। মাড়োয়ারীর আড়তের বচসা থামে। রাস্তার ঝামেলা নিস্তব্ধ হইয়া আসে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাজ চলিতে থাকে। বিপিনের তুলি চলে। কাপড়ের রং হয়। প্রত্যেকটি প্রতিমার পায়ের নীচে পদ্মের পাপড়ি-গুলি একে একে যেন ফুটিয়া উঠে। হাতের বীণাযন্ত্রের তারগুলি স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু চোখ তখনও হয় না। বিপিনের কেমন যেন ভয় করিতে থাকে। চোখের কাছে তুলি লইয়া গিয়া সে চুপ করিয়া থমকিয়া দাঁড়ায়, নিস্তব্ধ পথের প্রান্তে গ্যাসের

আলোর দিকে একবার তাকায়, গায়ের কাপড়টা ভাল করিয়া জড়াইয়া লইয়া বসে। তাহার পর কালো রঙে তুলি ডুবাইয়া আবার তাহার কাজ শুরু করে।

একটি প্রতিমার চক্ষুদান শেষ হয়। বিপিন উঠিয়া দাঁড়ায়। পিছু হাঁটিয়া দূর হইতে তাকাইয়া দেখে। আবার কাছে আসিয়া বসে। মাটির প্রতিমা যেন জীবন্ত হইয়া উঠে। নিস্তব্ধ গভীর রাত্রির নির্জনতা সে আর টেরও পায় না। চারশ চোখ যখন শেষ হইল বিপিনের চোখ তখন জড়াইয়া আসিয়াছে। রাত্রি প্রায় শেষ। বিছানা পাতাই ছিল। আলো নিভাইয়া দিয়া বিপিন শুইয়া পড়িল। অন্ধকার! তবুও মনে হয় দু'শ জোড়া চোখ যেন অনিমেষ নয়নে তাহারই দিকে তাকাইয়া আছে। তাহারই দিকে···

দু'শ সিকি। পঞ্চাশ টাকা!

বাড়ি হইতে চিঠি আসিয়াছে, ঘরখানি তাহার হঠাৎ সেদিন আগুন লাগিয়া পুড়িয়া গিয়াছে। খড় চাই, কাঠ চাই! পঞ্চাশ টাকা লইয়া সে বাড়ি যাইবে। ভাবনা কি?

উপর্যুপরি রাত্রি জাগার ঘুম! সকালে ঘুম তাহার আর ভাঙে না! শরৎ কারিগর অন্যদিন অতি প্রত্যূষে আসিয়া তাহাকে জাগাইয়া দেয়, সেদিন আর আসে নাই। বেলা প্রায় ন'টার সময় শরৎ আসিয়া তাহাকে টানিয়া তুলিল।

'ঠাকুর কই, ঠাকুর? পিতিমে?'

ধড়মড় করিয়া বিপিন উঠিয়া বসিল। সমস্ত চালাটা একেবারে ফাঁকা! মোটে দশটি প্রতিমা তখনও সারিবন্দী সাজান রহিয়াছে।

বিপিন বলিল, 'কোথা গেল পিতিমেগুলো?'

শরৎ বলিল, 'ঘুমিয়েছিলে ত নাকে তেল দিয়ে? বেশ—।'

রাত্রি-জাগরণ-ক্লান্ত চোখদুটি বিপিনের তখন কাঁপিতেছে। 'সে কি!'

শরৎ যেন অত্যন্ত রাগিয়া গেল। বলিল, 'এ ক্ষেতিটা কে গুনবে শুনি?'

বিপিনের কানে কিন্তু কোনও কথাই গেল না। সে তেমনি গুম হইয়া বসিয়া রহিল। শরৎ যেমন আসিয়াছিল, তেমনি চলিয়া গেল। বোধ করি যাইবার সময় মনে মনে খানিকটা হাসিয়াও গেল। তামাক সাজিয়া হুঁকাটি হাতে লইয়া বিপিন টানিতে বসিল। দশটি প্রতিমা মোটে! একটির মুখের পানে বিপিন একাগ্রদৃষ্টিতে তাকাইয়া রহিল। তামাক টানিতে সে ভুলিয়া গেল। চমৎকার! ঠিক যেন জীবন্ত! বিপিনের চোখে পলক আর পড়ে না। প্রতিমার চোখ দুটি যেন জ্বলিতেছে।

হঠাৎ বিপিন যেন তন্দ্রার ঘোরে লাফাইয়া উঠিল—

'দেখতে পাসনি? এত বড় বড় চোখ নিয়ে দেখতে পাসনি তুই?'

হাতের হুঁকাটা বিপিন সেই মাটির প্রতিমার মাথার উপর ভাঙ্গিয়া ফেলিল। হুঁকাও গেল, প্রতিমাও গেল। 'যাঃ—!'

'আর তুই?' আর একটা প্রতিমার মুণ্ডুটা বিপিন দুই হাত দিয়া সজোরে টানিয়া একেবারে ছিঁড়িয়া ফেলিল, 'মর! মর এইখানে!'

তাহার পর—আর-একটা! তাহার পর—সব।

লাথি মারিয়া মাটির প্রতিমাগুলি বিপিন চুরমার করিয়া টানিয়া ছিঁড়িয়া একেবারে একাকার করিয়া ফেলিল। রাগে তাহার চোখ দুইটা তখন লাল হইয়া উঠিয়াছে।

যাক—সব যাক।

দেওয়ালের পেরেক হইতে তাহার সেই পুরানো ছাতাখানি তুলিয়া লইয়া বিপিন পথে নামিয়া আসিল। কোথায় চলিতেছে, তাহার কোনও ঠিক ঠিকানা নাই···শহরের অফুরন্ত পথ!

মুখে চোখে তখনও পর্য্যন্ত একটুকু জল পড়ে নাই। পিপাসাও পাইয়াছে বটে! পথের ধারে একটা জলের কল। কয়েকটা হিন্দুস্থানী মেয়ে বাসন মাজিয়া উঠিয়া গেল। বিপিন ধীরে-ধীরে আগাইয়া গিয়া কলের নীচে অঞ্জলি পাতিয়া ধরিল। বাঁ হাত দিয়া সজোরে কলটা টিপিয়া ধরিতে ছির ছির করিয়া অত্যন্ত

ক্ষীণ একটুখানি জলের ধারা কলের মুখ বাহিয়া পড়িয়াই আবার ধীরে ধীরে বন্ধ হইয়া গেল। আবার টিপিল, কিন্তু কলের জল তখন বন্ধ হইয়া গিয়াছে। ভিজা হাতটা বিপিন তাহার চোখের উপর বার কতক বুলাইয়া লইয়া সুমুখে রৌদ্রতপ্ত পথের উপর নামিয়া পড়িল।

কিন্তু কোথায়…?

মৃত্যুভয়

ছেলের জন্য স্বামী-স্ত্রী, তুজনেই একেবারে পাগল হইয়া উঠিয়াছিল।

যাই হক, ভগবান মুখরক্ষা করিয়াছেন। হইল না হইল না করিয়া শেষ-বয়সে সুরুচির একটি ছেলে হইয়াছে। এবং ওই পড়ন্ত বয়সে হইয়াছে বলিয়াই ছেলেটি বোধকরি দেখিতে অতি চমৎকার।

ছেলের নাম-করণের সে কী ঘটা! হরিচরণ বলে, 'নাম রাখ কন্দর্প।'

সুরুচি হাসিয়া হাসিয়া ঢলিয়া পড়ে। বলে, 'দূর দূর। ওই কি আবার নাম হল নাকি? লোকে কেঁদো কেঁদো বলে ডাকবে। ছি!'

'তবে—?'

'কি নাম রাখা যায় বল ত?'

হবিচবণও ভাবে। সুরুচিও ভাবে। ভাবিয়া ভাবিয়া হয়রান! নাম আর কাহারও পছন্দ হয় না। শেষে নাম একটা হইল বটে, কিন্তু সন্তুষ্ট তাহারা তাহাতেও হইল না।

সুরুচি বলিল, 'পরে আবাব পালটে দিলেই চলবে।'

নাম হইল, সুন্দর। তা মন্দ হয় নাই। সুন্দর তাহাকে বলা চলে। যেমন রূপ তার তেমনি গড়ন। অমন ছেলে সচরাচর চোখে পড়ে না। সাদা ধপধপে গায়ের রং, কালো কোঁকড়ান মাথার চুল, ডাগর ডাগর চোখ, মুখখানি দেখিলেই ভালবাসিতে ইচ্ছা করে।

হরিচরণ, সুরুচি ও সুন্দর! এই তিনটি প্রাণীর ছোটখাটো সংসার! রাস্তার ধারেই রেলিং-দেওয়া ছোট্ট বাড়িখানি। উপরের

তিন চারখানি ঘরই তাহাদের পক্ষে যথেষ্ট। নীচের ঘরগুলি ভাড়া দেওয়া হইয়াছে। ছেলে যখন হয় নাই সুরুচি তখন তাহার ছেলের সাধ মিটাইবার জন্য একটি চন্দনা পাখী কিনিয়াছিল। দূর হইতে দেখা যায় পাখীটি এখনও রেলিং-এর উপর ঝুলান থাকে। সে এখন সুন্দরের খেলার সাথী।

সুন্দরকে কোলে লইয়া সুরুচি বারান্দায় আসিয়া দাঁড়ায়। পাখীর সঙ্গে ছেলের ভাব করিয়া দেয়। পাখী বলে, 'খোকা!'

খোকা বলে, 'চন্ননা।'

সুরুচি হাত তুলিয়া পাখীটাকে শাসন করে। বলে, 'খোকা বললি ত মেরে খুন করব তোকে। বল—সুন্দর!' পাখীটা কান পাতিয়া ঘাড় বাঁকাইয়া শোনে। সুন্দরের গায়ের উপর ঠোঁট বুলাইতে থাকে। কিন্তু 'সুন্দর' সে বলিতে পারে না।

হাত তুলিয়া সুন্দরও শাসন করে। বলে, 'মা-বো।'

এই 'মা-বো' কথাটির মধ্যে সুরুচি কী মাধুর্যের সন্ধান যে পায়—স্বামীকে ডাকিয়া বলে, 'শুনে যাও, ওগো শীগগির এস।'

হরিচরণ ছুটিয়া কাছে আসিয়া দাঁড়ায়।

সুরুচি বলে, 'পাখীটাকে আর একবার শাসন কর ত বাবা!'

সুন্দর শাসন আর করে না, চুপ করিয়া থাকে।

হাসি-হাসি মুখে সুরুচি তাহার স্বামীর মুখের পানে তাকাইয়া একটুখানি অপ্রস্তুত হইয়া গিয়া বলে, 'দূর দূর! এলে, না এতক্ষণ! আর শুনতে পেলে না। শাসন করছিল পাখীটাকে।'

হরিচরণ বলে, 'ও যে ছেলে হবে, বড় হলে আমাদেরই শাসন না করলে হয়।'

সুরুচি বলে, 'হাঁ রে?'

খিল খিল করিয়া হাসিয়া খোকা তাহার কচি কচি হাত দুইটি বাড়াইয়া বাবার কোলে গিয়া ওঠে।

হরিচরণ আদর করিয়া চুমু খাইয়া বলে, 'দুষ্টু ছেলে!'

সুরুচি বলে, 'খবরদার, দুষ্টু বল না বলছি, ও-আমার লক্ষ্মী

ছেলে। এস ত বাবা!' বলিয়া মা তাহাকে বাবার কোল হইতে কাড়িয়া লয়।

এমনি করিয়া সুন্দরকে লইয়া এই দুই প্রৌঢ় দম্পতির দিন কাটিতে থাকে।

সুন্দর বড় হয়। গত বৎসরের জামা এ-বৎসর আর গায়ে হয় না।

সুরুচি বলে, 'সুন্দরকে আমি ইস্কুলে দেব না কিছুতেই। বুঝেছ?'

হরিচরণ হাসিয়া বলে, 'বাড়িতে বসিয়ে মুখখু করে রাখবার ইচ্ছে?'

'না গো না। অতক্ষণ ছেলেকে আমি না দেখে থাকতে পারব না। তা ছাড়া শুনেছি নাকি মাস্টারগুলো ঠ্যাঙায়।'

হরিচরণ বলে, 'বেশ ত, বাড়িতে মাস্টার রেখে দেব।'

সুরুচি বলে, 'সেই ভাল।—দেখ, খোকার বৌ খোকাকে খুব ভালবাসবে কিন্তু।'

হঠাৎ সে কথার অর্থ হরিচরণ বুঝিতে পারে না। বলে, 'কেন?'

'এই দেখ না। এরই মধ্যে খোকার নাক ঘামছে।'

সুরুচি বলে, 'দেখ, এমন বৌ আনতে হবে, যে বৌ হবে দেশের সেরা। খুঁজে খুঁজে যেখান থেকে পাও। পয়সা কড়ি নেব না বরং তাও ভাল।'

হরিচরণ রসিকতা করিয়া বলে, 'তা হলে খুঁজতে বেরই এখন থেকে। না, কি বল?'

সুরুচি হাসিয়া বলে, 'হ্যাঁ বেরও। কেন, এমন ত কত হয়! ছেলে হবার আগেই কত লোক কথা দিয়ে রাখে।'

হরিচরণ বলে, 'শেষে শাশুড়ী-বৌএ বনিবনাও না হয় যদি?'

সুরুচি বলে, 'বটে! আমি কি তেমনি শাশুড়ী নাকি? ঝগড়া করব?—হ্যাঁরে খোকা, বৌ তোর আমার সঙ্গে ঝগড়া করবে?'

খোকার অত সব বুঝিবার মত বয়স তখনও হয় নাই। ঘাড় নাড়িয়া বলে, 'হ্যাঁ, কলবে।'

হরিচরণ হাসিয়া বলে, 'শুনলে?'

'ওরে দুষ্টু!' বলিয়া মা তাহাকে বুকের কাছে টানিয়া আনিয়া বলে, 'এখন থেকে তোমার এত বুদ্ধি। বল—করবে না।'

খোকা হাসিতে হাসিতে ঘাড় নাড়িয়া মায়ের গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলে, 'না। কলবে না।'

খোকার একটুখানি অসুখ হইলে মার চোখে আর ঘুম থাকে না। কাজকর্ম বন্ধ করিয়া দিয়া দিবারাত্রি সে তাহার শিয়রের কাছে বসিয়া থাকে। শহরে যেখানে যত ডাক্তার আছে, হরিচরণ সকলকেই একবার করিয়া ডাকিয়া আনে। হোমিওপ্যাথি ছাড়িয়া এলোপ্যাথি হয়, আবার এলোপ্যাথি ছাড়িয়া কবিরাজী চলে। একদিনের রোগ—ডাক্তার কবিরাজের কৃপায় দশদিনে ভাল হয়।

কোনও আব্দারই খোকার অপূর্ণ থাকে না। নিস্তব্ধ মধ্যাহ্নে শহরের পথে ফিরিওয়ালা হয়ত 'বাসন' হাঁকিয়া যায়। খোকা বলে, 'খাব।'

সুরুচি বলে, 'কোথাকার হাবা ছেলে রে! বাসন বিক্রি করছে, —বাসন।'

খোকা ঝোঁক ধরিয়া বসে, 'বাসন নেব।'

বাধ্য হইয়া সুরুচি বাসনওয়ালাকে ডাকিয়া খোকার জন্য ছোট ছোট রেকাবি কেনে, জল খাইবার জন্য ছোট একটি গ্লাস, ভাত খাইবার জন্য ছোট একটি থালা।

লোহার রেলিং-দেওয়া বারান্দা হইতে কোনও ফিরিওয়ালাই খোকার চোখ এড়াইতে পারে না। কাজেই দিনের মধ্যে কতবার কত জিনিস যে সুরুচিকে কিনিতে হয় তাহার ইয়ত্তা নাই।

জিনিসে জিনিসে ঘর একেবারে বোঝাই হইয়া উঠিয়াছে।

কত রকমের কত খেলনা আসিয়াছে! কত রকমের কত পুতুল!

হরিচরণ খোকার জন্য সেদিন একটি দম-দেওয়া টিনের রেলগাড়ী আনিয়া দিয়াছে। আর একটি দম-দেওয়া মটরকার।

সারা দুপুর কখনও বারান্দার উপর কখনও ঘরের মেঝেয় সড় সড় ঝড় ঝড় করিয়া খোকার রেলগাড়ী চলিতেছে, মোটরকার চলিতেছে।

খোকার হাস্য-কলরবে মুখরিত সুরুচির গৃহস্থালীর শ্রী এখন অন্য রকমের।

সুন্দরের বয়স এখন পাঁচের উপর, কিন্তু তবু তাহার আব্দারের

আর অন্ত নাই। অদ্ভুত তাহার আব্দার। সরস্বতী বিসর্জ্জনের দিন। ঢাক-ঢোল বাজাইয়া আলো জ্বালাইয়া শোভাযাত্রা করিয়া প্রতিমা যাইতেছিল। সুন্দর জেদ ধরিয়া বসিল, তাহার সরস্বতী চাই।

মা বলিল, 'দেব।'

বাবা বলিল, 'কাল তোকে দেব ওমনি একটা ঠাকুর কিনে।'

ঘাড় নাড়িয়া ছেলে বলিল, 'না। আমার এক্ষুনি চাই।'

এবং চাই ঠিক ওই ঠাকুরটিই। অন্য ঠাকুর হইলে চলিবে না।

চাঁদ-চাওয়া নীলমণি ছেলে। বেচারা হরিচরণকে তৎক্ষণাৎ বাহির হইতে হইল ঠাকুরের সন্ধানে। কিন্তু পটো-পাড়ায় সরস্বতী যাহারা গড়িয়াছিল, পূজার পর ঠাকুর তাহারা দিতে পারিল না।

কি যে করিবে কিছুই ঠিক করিতে না পারিয়া হরিচরণ বাড়ি ফিরিতেছিল। সুমুখে আর একটি প্রতিমার শোভাযাত্রা চলিতেছে।

একটা লোককে হরিচরণ জিজ্ঞাসা করিল, 'ওইরকম ঠাকুর কোথায় পাওয়া যায় বলতে পার?'

লোকটা একটুখানি অবাক হইয়া তাহার মুখের পানে তাকাইল।

হরিচরণ পাগল নয়। হাসিয়া বলিল, 'ছেলেটা ঝোঁক ধরেছে—ঠাকুর চাই। অথচ পটো-পাড়ায় পেলাম না।'

লোকটি বলিল, 'আসুন আমার সঙ্গে। নদীর জলে বিসর্জন দেবার সময় মুণ্ডুটা আপনাকে ছাড়িয়ে দেব।'

পূজা-করা প্রতিমার মুণ্ডু!

হরিচরণের বুকটা হঠাৎ ছ্যাঁৎ করিয়া উঠিল। তা হক। একেবারে না পাওয়ার চেয়ে ভাল। মাটির প্রতিমা, পূজার পর মন্ত্র পড়িয়া পুরোহিত উহাকে বিসর্জন দিয়াছে, এখনই উহাকে ঢেলার মত ছুঁড়িয়া জলে ফেলিয়া দিবে। তাহাতে দোষ কি!

নিরুপায় হইয়া হরিচরণ তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল।

দুই হাতে মাটির মুণ্ডুটি লইয়া হরিচরণ বাড়ি ফিরিল। খোকার খুশী যেন আর ধরে না! সুরুচি বলিল, 'ছি ছি, এ তুমি করলে কি গো! ওই পূজো-করা ঠাকুরের মুণ্ডু আনতে আছে?'

হরিচরণ বলিল, 'তা হক। তাতে দোষ নেই। অনেককে আমি শুধিয়ে এনেছি।'

দিন দুই পরে, সেদিন দুপুরবেলা, সুন্দর খেলা করিতেছে মাটির সেই মুণ্ডুটি লইয়া, সুরুচি পান সাজিতেছে, হরিচরণ ঘুমাইতেছে।

হঠাৎ চারিদিক অন্ধকার করিয়া মেঘ করিয়া আসিল। মনে হইল বৃষ্টি নামিবে। বারান্দায় কাপড় শুকাইতেছে। সুরুচির হা'ত জোড়া, বলিল, 'যা বাবা খোকা, নিয়ে আয় ত কাপড়-খানা তুলে।'

খোকা বলিল, 'আমি পারব না।'

সুরুচি বলিল, 'ভারি কথার অবাধ্য। যা বলব তাইতেই না। যা বলছি।'

খোকা তবু যায় না। বসিয়াছিল হাতের কাছেই। রাগিয়া পিঠের উপর এক চড় মারিয়া বলিল, 'যা বলছি হতভাগা, কথা শোন!'

মার খাইয়া সুন্দর কাপড় তুলিতে গেল। কিন্তু কাপড় তোলা হইল না। শহরে একটি সার্কাস পার্টি আসিয়াছে। ঘোড়ার গাড়ির উপর ব্যাণ্ডের বাজনা বাজাইয়া বিজ্ঞাপনের কাগজ বিলি করিতে করিতে সার্কাসের একদল লোক তখন রাস্তা দিয়া পার হইতেছিল। তাহাই দেখিবার জন্য রেলিংএর ধারে গিয়া সে চুপ করিয়া দাঁড়াইল। চারিদিকের আকাশ অন্ধকার করিয়া মাথার উপর তখন একটা ভীষণাকৃতি মেঘ উঠিয়াছে, আলো বন্ধ হইয়াছে, বাতাস বন্ধ হইয়াছে, এবং সেই ঘন-ঘোর মসীবর্ণ ছায়ান্ধকারের নীচে আলোহীন বায়ুহীন নিস্তব্ধ পৃথিবী যেন নিশ্বাস বন্ধ করিয়া আসন্ন প্রলয়ের ভয়ে জোড়হস্তে থর থর করিয়া কাঁপিতেছে।

ব্যাণ্ডের বাজনা তখনও থামে নাই। তাহাদেরই বাড়ির সুমুখের রাস্তা দিয়া বাজনা বাজাইয়া গাড়িটা তখন ক্রমশ নিকটবর্তী হইতেছে।

খোকা ছেলেমানুষ, নিতান্ত ছোট ; এপার হইতে ভাল দেখিতে পাওয়া যায় না, তাই সে কাপড় তোলার কথা ভুলিয়া গিয়া রেলিংএর ফাঁকে ফাঁকে পা দিয়া দিয়া উপরে উঠিয়া, নীচের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িল। এবং ঝুঁকিয়া পড়িয়া হাসি হাসি মুখে সে একাগ্র দৃষ্টিতে সেইদিক পানে তাকাইয়া তাকাইয়া দেখিতে লাগিল। দেখিতে লাগিল, পাড়ার যত ছেলেমেয়ে গাড়িটার পিছু পিছু ছুটিয়া আসিতেছে, গাড়ির ছাদের উপর বাজনা বাজিতেছে, ভিতর হইতে দুইটা লোক দু দিকের দরজায় হাত বাড়াইয়া লাল নীল নানা রঙের কাগজ ছুঁড়িয়া ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিতেছে, আর কোলাহল করিতে করিতে ছেলেগুলা মনের আনন্দে কেহ-বা সেগুলা হাতাহাতি করিয়া লুফিয়া লইতেছে, আবার কেহ কেহ বা হুমড়ি খাইয়া এ-উহার গায়ে পড়িয়া ঠেলাঠেলি করিয়া হট্টগোল বাধাইয়া তুলিতেছে।

ঘরের ভিতর হইতে মা ডাকিল, 'খোকা!'

'উঁ।'

'আয়!'

নীচের রাস্তায় হঠাৎ একটা প্রচণ্ড কোলাহল উঠিল। ব্যাণ্ডের বাজনা সহসা থামিয়া গেল। খোকার জবাবটা সেই গোলমালে শুনিতে না পাইয়া সুরুচি তাড়াতাড়ি বারাণ্ডায় বাহির হইয়া আসিয়া দেখে—সর্বনাশ! খোকা নাই।

রেলিংএর কাছে গিয়া নীচে রাস্তার উপর তাকাইয়া দেখে—মাগো! খোকা নীচে পড়িয়া গিয়াছে! সুরুচির সর্বশরীর হিম হইয়া গেল। হাত পা থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল।

কাঁদিয়া চীৎকার করিয়া স্বামীর ঘুম ভাঙাইয়া দিয়া সে কাঁপিতে কাঁপিতে সিঁড়ি ধরিয়া ছুটিয়া নীচে নামিতেছিল ; কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাহাকে পৌঁছিতে হইল না। নীচে নামিতে তখনও আর কয়েকটা ধাপ বাকি আছে, এমন সময় দেখিল, তাহারই অশ্রু-ভারাক্রান্ত অস্পষ্ট দৃষ্টির সম্মুখে তাহারই সেই পঞ্চমবর্ষ বয়স্ক রক্তাক্ত-কলেবর শিশুপুত্রটিকে কয়েকজনে মিলিয়া ধরাধরি করিয়া তাহারই কাছে লইয়া আসিতেছে।

উন্মাদের মত হরিচরণ 'ডাক্তার ডাক্তার' বলিয়া নীচে নামিতেছিল।

জনতার মধ্য হইতে কে একজন বলিয়া উঠিল, 'হয়ে গেছে।'

আর বেশি কিছু বলিবার প্রয়োজন হইল না। কথাটা শুনিবামাত্র সিঁড়ি হইতে গড়াইয়া গড়াইয়া সংজ্ঞাহীনা সুরুচি একেবারে উঠানে আসিয়া পড়িল। হরিচরণ হো হো করিয়া কাঁদিয়া উঠিয়া চীৎকার করিয়া ঝাঁপাইয়া একেবারে লোকজনের মাঝখানে আসিয়া খোকাকে তাহাদের হাত হইতে ছিনাইয়া লইয়া, পাগলের মত উর্দ্ধশ্বাসে উঠানময় ছুটিয়া বেড়াইতে লাগিল। ঘন ঘন খোকার রক্তমাখা বিকৃত বীভৎস মুখের পানে তাকাইয়া তাকাইয়া সে এমন অসহায় ভাবে হায় হায় করিয়া কাঁদিতে শুরু করিল যে তাহা দেখিয়া পাষাণও গলিয়া যায়।

নীচের ভাড়াটে-বাড়ীর মেয়েরা তখন সুরুচিকে লইয়া ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে।

মূর্চ্ছা আর তাহার কিছুতেই ভাঙে না। একবার যদিই-বা গোঁ গোঁ করিয়া জ্ঞান হয়, তৎক্ষণাৎ আবার 'খোকা খোকা' বলিয়া অজ্ঞান হইয়া পড়ে।

মাঝ-দরিয়ায় নৌকাডুবি হইলে যেমন হয়, ইহাদেরও ঠিক তেমনি হইয়া গেল।

স্বামী-স্ত্রী, আবার তাহারা উঠিয়াও বসে, আবার তাহারা আহারাদি করিয়া চলিয়া ফিরিয়াও বেড়ায়। দিব্য সহজ মানুষের মতই আবার তাহাদের কথা কহিতে হয়।

স্ত্রী একদিন বলিল যে, ওই সরস্বতীর মুণ্ডুটাই হইল কাল!

কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, 'বলেছিলাম না, পুজো-করা পিতিমের মাথা, ঘরে আনলে অমঙ্গল ঘটে। দিই এটাকে ফেলে।'

বলিয়া সেই মাটির মাথাটাকে সুরুচি সেদিন ফেলিয়া দিতে যাইতেছিল, হরিচরণ নিষেধ করিল। বলিল, 'না থাক। করুক অমঙ্গল! আর ও আমাদের কি করবে শুনি?'

মুণ্ডুটা তাকের উপর যেখানে রাখা ছিল, সেইখানেই রহিল।

বাঁচিয়া থাকিয়া তাহাদের আর সুখ নাই। এবার যেন তাহারা মরিতে পারিলেই বাঁচে। খোকাই যখন চলিয়া গিয়াছে তখন আর এ পৃথিবীতে তাহাদের আছে কি!

হরিচরণ বল, 'দূর ছাই! এই ত জীবন! আজ আছি কাল নেই। এস মরি আমরা দুজনে।'

মৃত্যুর নামে সুরুচি উল্লসিত হইয়া ওঠে। বলে, 'কেমন করে মরি বল ত?'

'দুজনে একসঙ্গে বিষ খাই এস, পাশাপাশি শুয়ে থাকি।'

সুরুচি বলে, 'সেই ভাল। বাড়ি-ঘর-দোর যাকে খুশী দান করে দিয়ে যাই। মিছে নয়, বল তুমি বিষ আনবে?'

হরিচরণ বলে, 'হ্যাঁ, দেখি চেষ্টা করে, লুকিয়ে আনতে হবে। খুব সহজে যাতে মৃত্যু হয়। শেষে, না পাওয়া যায় ত···আফিম।'

হরিচরণ গোপনে বিষ আনিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। কিন্তু বিষ পাওয়া বড় সহজ কথা নয়।

এদিকে সুরুচি তাহার চক্ষের মণি বক্ষের মাণিক হারাইয়া ঠিক পাগলের মত হইয়া উঠিয়াছে! বাঁচিবার সাধ তাহার আর নাই। যে পৃথিবী, খোকা বাঁচিয়া থাকিতে আলোকে আনন্দে হাসিতে গানে বিপুল সৌন্দর্যে পরিপূর্ণ ছিল বলিয়া মনে হইত, আজ তাহাই তাহার কাছে শুধু মিথ্যা, শুধু মরীচিকা দিয়া গড়া বলিয়া মনে হয়। আশার এতটুকু ইঙ্গিতের চিহ্ন কোথাও নাই, বিধাতা নাই, স্রষ্টা নাই, নিবিড় তমসাচ্ছন্ন দুঃখ-দুর্ভোগ ছাড়া কোথাও কিছু নাই। এবং সেই দুঃখ-দুর্ভোগের চিরান্ধকার রাত্রির মাঝে যে-বহ্নি সহসা প্রজ্বলিত হইয়া উঠে, নির্বোধ নরনারী তাহাকেই ভাবে বুঝি বিধাতার আশীর্বাদ! অসহায় মানব তাহাতেই পুলকিত হয়, আশায় বুক বাঁধিয়া বৃথাই বাঁচিয়া থাকে! সীমাহীন আশাহীন মৌন মূক স্তব্ধতার মধ্যে তাপদগ্ধ মরুবালুকার মাঝখানে পথভ্রান্ত পথিকের চোখের সুমুখে মায়া-মরীচিকার মত সে আলেয়ার বহ্নি-শিখা যেমন দপ করিয়া জ্বলিয়া ওঠে, আবার তেমনি নিঃশব্দেই নিভিয়া যায়। চিরনিষ্ঠুর চিরনির্বাক যে-বিধাতা তাহাকে এমনি

করিয়া পরিহাস করিয়াছে, যে তাহাকে দুঃখ দিয়া আনন্দ লাভ করিয়াছে, তাহাকে সে-আনন্দ হইতে সে বঞ্চিত করিবেই। সে মরিবে।

সুরুচি বারান্দায় গিয়া দাঁড়ায়। লোহার রেলিং-এ ভর দিয়া নীচের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া থাকে। চাহিয়া চাহিয়া হঠাৎ তাহার সেই অঞ্চলের নিধি চঞ্চল বালকের কথা মনে পড়ে, মনে পড়ে, এইখান হইতে এমনি করিয়াই সে পড়িয়া মরিয়াছে! যাইতে সে চায় নাই, সে-ই তাহাকে জোর করিয়া কাপড় তুলিতে পাঠাইয়াছিল, সে নিজেই তাহাকে হত্যা করিয়াছে। ভাবিতে গেলে তাহার আর জ্ঞান থাকে না, বুকের ভিতরটা কেমন যেন করিতে থাকে, রেলিং পার হইয়া নিজেও সে সেইখানে পড়িয়া মরিতে চায়। কিন্তু ভয় হয়, কচি ছেলে, সামান্য আঘাতও তাহার সহ্য হয় নাই, তাই মরিয়াছে। কিন্তু সে নিজে যদি না মরে! যদি পঙ্গু হইয়া বাঁচিয়া থাকে···

স্বামীকে তাই সে বারে বারে জিজ্ঞাসা করে, 'এনেছ?'

হরিচরণ কথাটা হঠাৎ বুঝিতে না পারিয়া ফ্যাল ফ্যাল করিয়া তাহার মুখের পানে তাকাইয়া থাকে, তাহার পর খোকার সেই কচি মুখখানি মনে পড়িতেই নিজেও সে ঝর ঝর করিয়া কাঁদিয়া ফেলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়া বসে, আজ সে আনিবেই। যেমন করিয়া হক, যেখানে হক, মৃত্যুর অমৃত সে সংগ্রহ করিবেই।

পাড়ায় হঠাৎ বসন্ত দেখা দিয়াছে। শীত কাল। হরিচরণ সেদিন বাড়ি ফিরিল গায়ে সামান্য জ্বর লইয়া। মাথাটা ধরিয়াছে, গায়ে হাতে বেদনা, সামান্য সর্দি। হয়ত বা ঠাণ্ডা লাগিয়াছে। আসিয়াই শুইয়া পড়িল। সুরুচিকে বলিল, 'শোন!'

'কি!'

'তেল একটুখানি গরম করে আন ত!'

'কেন? তেল কি হবে?'

'আছে কাজ।'

স্বরুচি তেল আনিতে গেল!

ফিরিয়া আসিয়া ছোট একটি বাটির সন্ধানে তাকের উপর নজর পড়িতেই দেখিল, সরস্বতীর সেই মাটির মুণ্ডুটি নাই।

'কোথায় গেল সেটা?' বলিয়া এদিক-ওদিক তাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'হ্যাগো, জান তুমি?'

হরিচরণ সাড়া দিল না।

অনেকক্ষণ পরে জিজ্ঞাসা করিল, 'কি?'

'সেই যে মুণ্ডুটা ছিল এইখানে।'

'জানি না।' বলিয়া হরিচরণ পাশ ফিরিয়া শুইল।

স্বরুচি জিজ্ঞাসা করিল, 'হ্যাঁ, কি করতে হবে বল ত?'

পা দুইটা বাড়াইয়া দিয়া হরিচরণ বলিল, 'পায়ের তলায় বেশ ভাল করে মালিশ করে দাও দেখি। কেমন যেন সর্দি-সর্দি বোধ হচ্ছে, শরীরটা ভাল নেই আজ।'

স্বামীর পায়ে তেল মালিশ করিতে বসিয়াও স্বরুচি সেই মুণ্ডুটার কথা ভুলিতে পারিল না। বলিল, 'বাঃ, এ ত বেশ ভৌতিক কাণ্ড দেখছি। বাড়ি থেকে জিনিস উড়ে গেল?'

'না না, উড়ে আবার যায় নাকি?' নিতান্ত তাচ্ছিল্য-ভরে হরিচরণ বলিল, 'সে আমি ফেলে দিয়েছি।' বলিয়া চোখ বুজিয়া হরিচরণ বোধকরি বসন্তের ভয়েই ডান হাত দিয়া নিজের গায়ের উত্তাপ নিজেই অনুভব করিতে লাগিল।

জনি ও টনি

বিলাতি কুকুর, তাই ইংরেজি নাম—জনি ও টনি। এক মা'র পেটের দুটি বোন। জনির গায়ের রং ঠিক চিতাবাঘের মত, আর টনি ছিল—ফিট সাদা। জনির কপাল ভাল। গলায় রূপোর মত ঝকঝকে ঘুঙুর-দেওয়া কালো-চামড়ার বকলস, ভাল খায় ভাল থাকে। জ্যেঠামশাইএর ঘরে তখন খুব বাড়-বাড়ন্ত, শহরের কারবার বেশ ভালই চলে, চাল-ধানের বাজার তখন খুব গরম।

শহর থেকে জনির জন্যে টিন-ভর্তি বিস্কুট আসে, আর ভাল-ভাল সাবান। টনি ত টনি, আমরা নিজেরা কখনও সে-রকম সাবান মাখিনি।

স্নান করতে গিয়ে দিদি সেদিন পুকুরের ঘাট থেকে ফিরে এল।

'নাঃ, চান করা আর হল না দেখছি! কুকুরকে আবার সাবান মাখায় কোনকালে, পুকুরের ঘাটে? জ্যেঠামশাইএর ছেলে ত নয়, —যেন এক-একটি—'

সুমুখ দিয়ে আমি পেরিয়ে যাচ্ছিলাম। হঠাৎ আমার ওপর নজর পড়তেই দিদি বলে উঠল, 'এই যে! ইনিই বা আমাদের কিসে কম? বেশ ত ছিল বাপু, দুটো বাচ্চাই ছিল ওদের ঘরে, তুই আবার মরতে কি জন্যে আনতে গেলি একটা—বল ত?'

'তুমি জান না দিদি, কেমন ডাকে দেখেছ ঘেউ ঘেউ করে?' চোর তাড়ায়।'

দিদি বলে, 'হ্যাঁ, ধান-চালের ত ছড়াছড়ি, তাই চোর আসছে রোজ চুরি করতে! এনেছিস, বেশ করেছিস, ওই কলাতলায় বেঁধে রাখ, ছাড়িসনে। ছাড়া পেয়েছে কি, এক্ষুনি ঘর-দোর সব ভাসিয়ে দেবে হেগে-মুতে।

টনির দিকে একবার আড়চোখে তাকিয়ে দিদি চলে যায়। বলে,

'চোর তাড়ায়! ঢাল নেই, তলোয়ার নেই, নিধিরাম সর্দার! এক-রত্তি কুকুর, একটা লাথির ভার সয় না, চোর তাড়াচ্ছে···চেঁচায় কি সাধে? চেঁচায় ভয়ে।'

টনি আমাদের কলাতলাতেই বাঁধা থাকে। দিদির চক্ষুশূল। খেতেও পায় তেমনি। এর-ওর উচ্ছিষ্ট ভাত-কাঁটা, পাতে যা পড়ে থাকে, নিতান্ত অগ্রাহ্য করে টনির মুখের কাছে দিদি তাই ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলে দেয়, পেটের জ্বালায় টনি গব-গব করে গেলে।

সেদিন ইস্কুল থেকে ফিরে এসে দেখি, টনি আমাদের তিন-পায়ে হাঁটছে। পেছনের একটা পা তার খোঁড়া।

ছোট বোন হেনা বললে, 'আর একটু হলেই টনি তোমার আজ মরেছিল দাদা!'

'কেন?'

'মাছের কাঁটা লেগেছিল গলায়।'

'কাঁটা?'

'হ্যাঁ কেশে কেশে বমি করেছিল ত্রুবার। দিদি তখন করলে কি—'

হেনা একবার এদিক ওদিক তাকিয়ে নিয়ে চুপি চুপি বললে, 'বলে, খালি খালি কাশছে দেখ হতভাগী খ্যাঁক খ্যাঁক করে! বলেই দম করে এক লাথি! আর একটু হলেই—'

আরও কি-যেন সে বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু দিদিকে দেখেই মুখের কথা তার মুখেই আটকে রইল।

দিদি বললে, 'চুন আর হলুদ গরম করে রেখেছি, বেঁধে দে ও-হতচ্ছাড়ীর পায়ে।—মাছের কাঁটা কেন খেতে যাওয়া লো তোর সর্ব্বনাশী, পোড়ারমুখী?'

টনি কি বুঝলে কে জানে। জিভ বার করে হাঁপাতে হাঁপাতে দিদির মুখের পানে সে মিট মিট করে তাকিয়ে রইল।

ছ'টি মাস পেরতে না পেরতেই টনি বেশ ডাগর হয়ে উঠল। খোঁড়া পা তার সেরে গেছে। এখন আর তাকে দড়ি দিয়ে বেঁধে

রাখতে হয় না। যখন তখন যেখানে সেখানে যায়, আবার ঠিকসময়ে ফিরে আসে। দরজার কাছে পড়ে পড়ে জিভ বার করে হাঁপায়।

গরু ছাগল দেখলেই ঘেউ ঘেউ করে ওঠে। হাঁস মুর্গী ত ত্রিসীমানায় আসবার উপায় নেই।

সেদিন একটা কোলা ব্যাং বেরল মাটির ঘরের ফাটল থেকে। আর যায় কোথায়! টনি ছিল দরজায় বসে, ঝাঁপিয়ে উঠে তার সুমুখে এসে দাঁড়াল।

প্রাণের ভয়ে ব্যাংটা লাফিয়ে লাফিয়ে পালাবার চেষ্টা করে। টনি ঘেউ ঘেউ করে এগিয়ে যায়। সুবিধা পেলেই ব্যাংটা আবার মারে লাফ। টনি ভাবে, বুঝি দিলে কামড়ে! অমনি দুহাত পিছিয়ে আসে।

এমনিধারা ঝাঁপাঝাঁপির লড়াই চলল কিছুক্ষণ।

ব্যাংটাই হারল শেষে। টনি তার ধারাল দাঁত দিয়ে কোলা-ব্যাঙের পেটটা দিলে ফুটিয়ে। মোটা চামড়ার ভেতর থেকে নাড়ি-ভুঁড়ি সব বেরিয়ে পড়েছে। হাঁ করে পথের মাঝে মরা ব্যাংটা পড়ে রইল। টনির আনন্দ দেখে কে! লেজ তার ছোটবেলা থেকেই ছিল না! গোড়ার দিকে ইঞ্চিখানেক যেটুকু ছিল, তাই তখন টুক টুক করে নাড়ছে···

ঘুঙুরের শব্দ হতেই ফিরে দেখি, বাঁটুল আসছে জনিকে নিয়ে। পুকুরের ঘাটে চলল বুঝি সাবান মাখাতে।

'ছোঃ! ভারি ত একটা ব্যাং মেরেছে। জনি একটা পাখী মেরেছিল সেদিন।'

বললাম, 'টনিও পারে।'

'হ্যাঁ পারে—। জনির মত কথা শোনে? জনি! জনি! তু!'

দূরে মরা-ব্যাংটা জনি তখন শুঁকে দেখছিল। বাঁটুল ডাকতেই ঘুঙুর বাজিয়ে ঝুম ঝুম করে জনি তার কাছে ছুটে এসে দাঁড়াল!

'কই, টনি তোদের শুনুক দেখি এমনি—?'

জনির সুমুখের দুটো পা উপরের দিকে তুলে ধরে তাকে দাঁড় করিয়ে দিয়ে বাঁটুল বললে, 'দাঁড়িয়ে থাক, নড়িস নে।'

জনি মানুষের মত পিছনের পায়ের ওপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

'দেখেছিস? কই কামড়াক দেখি? কখখনো কামড়াবে না।'

বাঁটুল তার মুখের ভেতর ডান-হাতের মুঠোটা ঢুকিয়ে দিলে।

দূরে একটা পুকুরের পাড়ে তেঁতুলগাছের তলায় আমাদের টনি তখন মাটি শুঁকে শুঁকে বেড়াচ্ছে।

ডাকলাম, 'টনি! টনি!'

টনি একবার ফিরেও তাকালে না।

জনির চারটে বাচ্চা হয়েছিল। কিন্তু বড় না হতে হতেই সাদা বাচ্চাটা গেল মরে। বাকি যে তিনটে থাকল, সে তিনটে বড় হল বটে, কিন্তু বাঁটুলদের ঘরে কেউ আর রইল না। লাল বাচ্চাটা দেখতে ভারি সুন্দর হয়েছিল, কিন্তু মোড়লপাড়ার কুত্তিটার সঙ্গে তার যে কী সর্বনেশে দোস্তি হল কে জানে; দিন নেই, রাত নেই সেইখানেই পড়ে থাকে।

গাঁয়ে একদিন বিদেশী ভেড়িওয়ালা আসে একদল। সঙ্গে তাদের কুকুর ছিল। কালো বাচ্চাটা সেই তাদের সঙ্গে কোথায় কোন দেশে যে চলে গেল, তার আর পাত্তা পাওয়া গেল না।

বাকি রইল খয়রাটা। মনসাপূজোর সময় দূরের একটা গাঁ থেকে একজন মুসলমান দোকানদার আসে চুড়ি বেচতে। সেই-অবধি শুনছি নাকি সে তারই ঘরে আছে। বাঁটুল দুদিন তাকে আনতে গিয়েছিল, কিন্তু ডাকতে গেলেও আসে না, এমনি নিমকহারাম। জনি এখন ঢুন-মুন করে বেড়ায়। পেটটা তার ঝুলে গেছে। সম্ভবত কার্তিক মাস। শীত তখন পড়ি-পড়ি করছে।

প্রকাণ্ড একটা সাদা রঙের বাঘা-কুকুর কোত্থেকে এল কে জানে! আমাদের ঘরে এসে আড্ডা গেড়েছে। দিদি বললে, 'এঁর আবার কোত্থেকে আগমন হল, এই মোহন্ত মহারাজের?'

কুকুরটাকে তাড়িয়ে দিয়ে বাইরের দরজাটা বন্ধ করে দিলাম।

কিন্তু তাড়ালে কি হবে, খানিক বাদেই দেখি, খিড়কির ঘাটের

দরজার নীচের নর্দমার ফুটোর ভেতর দিয়ে অতি কষ্টে গলিয়ে এসে বাঘা-কুকুরটা আবার আমাদের ঘরে ঢুকেছে।

কলাতলায় ছায়ায় বসে বসে সে তখন তার আধহাতখানেক জিভ বের করে হাঁস-ফাঁস করছিল।

থাকে থাক। কিন্তু ছ'ইঞ্চি লম্বা মোটা মোটা ধারালো দাঁত, ঝগড়া করে টনিকে কামড়ায় যদি কোনদিন, তাহলে সে আর বাঁচবে না কিন্তু।

দিদি বলে, 'তোমায় পেট ভরে ভাত দিতে হলেই ত গিয়েছি আর-কি! আধসের চালের ভাত নইলে গোবদার ও-পেট আর ভর্তি হয় না! হয় শুকিয়ে মর, নয় আধ-পেটা খাও, নইলে বাড়ি যাও। বুঝলে?'

কিন্তু ভারি মজা দেখলাম। কুকুরটা শুকিয়ে মরে, খায় না। সেদিন ভাত নিয়ে কত সাধ্য সাধনা করলাম। কিছুতেই খেলে না।

টনির সঙ্গে ঝগড়া ঝাঁটি করবে ভেবেছিলাম, কিন্তু তাও না। দুজনে ভারি ভাব।

ও-বাড়িব বৌ সেদিন আমাদের বাড়ির দিকেই আসছিল।

আমাকে দেখেই খানিক হেসে বললে, 'তোমাদের এক সন্নেসী জামাই এসেছে নাকি আজ কদিন? দেখে আসি চল।'

পৌষের দুরন্ত এক শীতের রাত্রে আমাদের টনির তিনটি বাচ্চা হল। তুলোর মত নরম টুকটুকে বাচ্চা তিনটি। কাঁচের চোখের মত ছোট ছোট চোখ, তখনও ভাল করে ফোটেনি।

কিন্তু এমনি দুর্দৈব, প্রসব হবার পরদিন থেকে টনির কি যে হল কেউ বুঝতে পারলে না। তিন দিনের দিন দেখা গেল, আমাদের গোয়ালের পাশে একগাদা খড়ের ওপর চিৎ হয়ে শুয়ে টনি মরে পড়ে আছে। পা-চারটে খাড়া সোজা হয়ে গেছে। বাঁ'পাশের চোয়াল বেয়ে সাদা খানিকটা ফেনার সঙ্গে রক্তও গড়িয়েছিল বোধহয়। খড় রক্তে ভিজে লাল হয়ে গেছে।

দুটো বাচ্চা কুঁই কুঁই করে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। আর একটা

পড়েছিল মরা মায়ের মাই কামড়ে। এত জোরে কামড়ে ধরেছিল যে টেনে ছাড়ায় কার সাধ্যি……

হেনা বলেছিল, 'বেশ হল দাদা, আমাদের তিনটে আর একটা —চারটে কুকুর হল।'

পায়ে দড়ি বেঁধে টনিকে দূরের একটা মাঠের উপর ফেলে দিয়ে আসা হল। খাওয়া-দাওয়ার পর গিয়ে দেখি, শেয়াল-শুকনির হাট বসে গেছে সেখানে। টনিকে নিয়ে তারা টানাটানি ছেঁড়াছেঁড়ি শুরু করেছে।

বৈকালে গিয়ে টনিকে আর দেখতে পাওয়া গেল না। দেখলাম, শিরদাঁড়া আর পাঁজরার হাড় ক'খানা মাত্র পড়ে আছে।

বাড়ি ফিরে দেখি, ও-বাড়ির জনি এসেছে আমাদের বাড়ি। কোনদিন আসে না, আজ কেন এল বুঝতে পারলাম না।

রাত্রে উঠে আলো নিয়ে টনির বাচ্চাগুলোর সন্ধান করতে গিয়ে দেখলাম, গোয়ালের পাশে, টনি যেখানে মরেছিল, জনি সেইখানে শুয়ে আছে। আর বাচ্চা তিনটি তার পেটের তলায় মুখ গুঁজে মাই টানছে।

জনি যখন-তখন আমাদের ঘরে আসতে লাগল। আসে আর সেই গোয়ালের পাশে পড়ে থাকে। টনির বাচ্চা তিনটিকে মাই দেয়।

কোন কোন দিন সারারাত থাকে, সারাদিন থাকে—।

পাঁচ সাত দিনের পর একদিন সকাল বেলা, সূয্যি তখনও ওঠেনি।

গত রাত্রে জনি আমাদের বাড়িতেই ছিল।

বাঁটুল দরজায় এসে হাঁকছে! দরজা খুলতেই সে আর আমায় কিছু বললে না। একেবারে গোয়ালের পাশে গিয়ে হাজির! শিকলিটা তার হাতেই ছিল। জনির গলার বকলসে লাগিয়ে জনিকে সে টেনে নিয়ে চলল।

জনি কিন্তু কিছুতেই যাবে না। পেছনের পায়ের নখ দিয়ে সে মাটি চেপে ধরে। আর বাঁটুল তাকে সুমুখের দিকে টানে।

দুজনে মিলে সে কি টানাটানি। জনি ফিরে ফিরে আসতে চায়, আর বাঁটুল তাকে প্রাণপণে টেনে নিয়ে চলে।

দিদি বললে, 'ছেড়েই দে না ভাই বাঁটুল, আহা, বাচ্চা তিনটে বাঁচুক।'

বাঁটুল চোখ পাকিয়ে বলে উঠল 'না।'

জনিকে সেদিন সে টেনেই নিয়ে গেল। সে দিন আর সে এল না। আসতে দিলে না হয় ত। তার পরের দিনও না। গাইয়ের দুধ খেয়ে আর কতক্ষণ বাঁচে! পরের দিন সকালে উঠে দেখি, কলতলায় একটি বাচ্চা মরে পড়ে আছে।

একটি গেল।

বাঁটুলকে সেদিন ডেকে বললাম, 'জনিকে অন্তত একবার করেও ছেড়ে দে না ভাই, আমরা খেতে দিই ওকে।'

বাঁটুল বললে, 'আমাদের বাড়ীতেও উপোস দেয় না, খেতে পায়।'

সেদিন সকালে দেখি, একটিমাত্র বাচ্চা নড়বড় করে বেড়াচ্ছে। আর-একটার খোঁজ করলাম। খিড়কির পাশে পুকুরের জলে সে ভাসছিল। অন্ধকার রাত্রে হয়ত সে তার মরা-মার খোঁজে বেরিয়েছিল···

রাত্রে আমরা তখন দরজা বন্ধ করে শুয়েছি। কে যেন দরজা ঠেলছে!

দিদি হাঁকলে, 'কে?'

উঠে গিয়ে দরজা খুললাম, দেখি, জনি! সাঁ করে ঘরে ঢুকে পড়ল।

বকলসের সঙ্গে-আঁটা গলায় তার ছেঁড়া শেকল মাটিতে লুটিয়ে ঝুন-ঝুন করে আওয়াজ হচ্ছে।

দিদি অবাক হয়ে চেয়ে রইল।

দরজাটা বন্ধ করে দিতে যাচ্ছি, গলার শেকলটা মাটির ওপর দিয়ে সর সর করে টানতে টানতে জনি আবার এসে হাজির!

অবাক কাণ্ড! টনির শেষ বাচ্চাটির ঘাড়ে কামড়ে ধরে সে তাকে মুখে করে তুলে নিয়ে যাচ্ছে।

কেন মিছেমিছি, আসতেও পারে না, তাই নিজের কাছেই নিয়ে চলল বোধ হয়।

ভালই হল!

বাঁটুলদের বাড়িতে গিয়ে বাচ্চাটিকে প্রায়ই দেখে আসি।

দিনে দিনে বেশ বড হয়ে উঠছে। দেখতে, হুবহু তার মায়ের মত।

জ্যেঠাইমা বললেন, 'হককথা বলতে গেলে বাচ্চাটি আমাদেরই। রাখতে পারিসনে ত কুকুরের শখ কেন বাপু? জনি-টনি অমনি আসেনি। দাম লেগেছিল, তার ওপর রেলের মাশুল না-হয় ছেড়েই দাও।'

গাঁয়ে হঠাৎ সেদিন আগুন লাগল কেমন করে কে জানে! বিষ্টু মিস্ত্রির খামারে লাগে প্রথম। দেখতে দেখতে পাশাপাশি আরও তিনখানা ঘর। তারপর লাগল সরকারী কালীঘরে। পাশেই বঁটুলদের ঘর। লাগল ওদের রান্নাঘরের চালে। দেখতে দেখতে গোয়াল গেল। জিনিসপত্র সামলাবার আর অবসর পেলে না কেউ! মেজদি গরু-বাছুরগুলো খুলে দিয়েছিল কিন্তু। আমাদের ঘর যদিও দূরে, তবু সামলাবার ব্যবস্থা হচ্ছে তখন।

দিদি জ্যেঠামশাইএর বাড়ির দিকে ছুটেছিল। আগুন নিবলে পর খানিক বাদে ছুট্‌তে ছুট্‌তে খবর নিয়ে এল—

'আর পুষবি? ভারি যে দিনকতক দহরম-মহরম হয়েছিল কুকুর নিয়ে। ওই দেখগে যা—বাঁটুলকে দিলে কামড়ে! পা দিয়ে দর দর করে রক্ত গড়াচ্ছে!'

'কে? জনি?'

'তা না ত কে? দুধ-কলা দিয়ে সাপ পোষা বই ত নয়!'

কিন্তু সে-কথা বিশ্বাসই বা করা যায় কেমন করে! জনি কামড়াবে বাঁটুলকে?

'না তুমি জান না দিদি, জনি নয়—তাহলে আমাদের টনির সেই বাচ্চাটা হবে।'

দিদি কিন্তু তাকে স্বচক্ষে কামড়াতে দেখে এসেছিল। বললে, 'আমি নিজে দেখে এলাম!'

'এমনি কামড়ে দিলে? শুধু-শুধু?'

দিদি কিন্তু সেকথা জানত না, কামড়াতেই মাত্র দেখেছিল।

দরজার কাছে পাড়ার মেয়েদের তখন জটলা চলছে। আগুনে কার কি ক্ষতি হল তারই হিসেব-নিকেশ। একজন বললে, 'না লো না, শোন, আমি দেখে এলাম।' আর একজন বললে, 'গরু মরা, কুকুর মরা, একই কথা প্রাশ্চিত্তি ত করতে হবে, না, তা হবে না? চঞ্চলীর বেশ বুদ্ধি যা যাহোক! গরু খুললি, বাছুর খুললি, আর ওই একরত্তি কুকুরটাকে খুলে দিতে পারলি না? আ মর!'

'বাচ্চা কুকুরটাকে পুড়িয়ে মারলে গা ঘরের ভেতর!...সে কী চেঁচানি বাছা! কাঁই, কাঁই, কাঁই, পাড়াশুদ্দু কলরব তুলে দিয়েছিল।'

যে-মেয়েটা প্রথম আরম্ভ করেছিল, সেই শেষ করলে।

'বাচ্চাটার কাছে যাবার জন্যে ওদের বুড়ি কুত্তিটার সে কী ছটফটানি মা, হাঁ হাঁ করে আগুনের ওপর ঝাঁপিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তে যায়! এমনি করে-করে...'

সুমুখে দেওয়ালটার ওপর নিজের হাত-দুটো দিয়ে আঁচড় কেটে কেটে মেয়েটা কোনরকমে সবাইকে বুঝিয়ে দিলে।

'ওই কুত্তিটাকে ধরতে গিয়েই ত—'

'হ্যাঁ, বাঁটুল ওকে দড়ি দিয়ে বেঁধে রেখেছিল।'

মুখের কাছে হাত নেড়ে মেয়েটা বললে, 'বেঁধে রাখলে কখন লা? বাঁধতে যাচ্ছিল, আর খপ করে অমনি দিলে কামড়ে।'

হেনা তখনও পর্যন্ত বিশ্বাস করতে পারছিল না, দিদির মুখের পানে চেয়ে বললে, 'তুমি সেদিন দেখনি দিদি, বাঁটুল এই এতখানা হাতের মুঠোটা পুরে দিয়েছিল ওর মুখে। কিচ্ছু বললে না— কামড়ালে না, কিছু না।'

দিদি বললে, 'হ্যাঁ, ও-জাতকে আবার বিশ্বাস করে কখনও? রামঃ!'

কে একটি মেয়ে বললে, 'না মা, আমাদের ঘরে ওই বালাইটি নেই কখনও! বুটুর বাবা বলে, 'হক ভৈরবের বাহন, কুকুর-টুকুর গুলো আমার ছু'চক্ষের বিষ!'

হেনা বললে, 'আচ্ছা দাদা, বাচ্চাটি এই, এত বড় হয়েছিল, নয়? আমাদের ওই ঘটিটির মতন উঁচু।'

দিদি ভাবলে, কথাটা বুঝি তাকেই জিজ্ঞেস করা হচ্ছে। বললে, 'কে জানে তা! ঘটির মতন না গাড়ুর মতন তোরাই জানিস।'